Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal.
[Vide Circular No. 26/66, dated 24. 11. 66.]

মানব-ইতিহাসের ধারা

প্রাচীন যুগ : ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

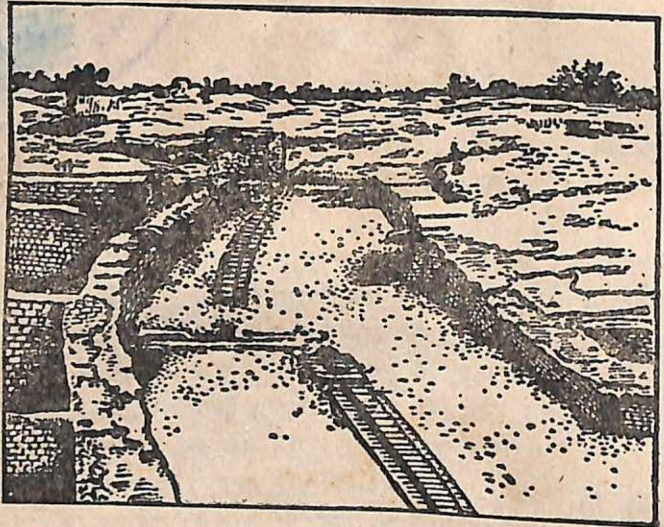
ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী এম. এ., এল. এল. বি., ডি. ফিল.

	প্রথম	প্রকাশ	: ১৯৫৪
দ্বিতীয়	পরিমার্জিত	মুদ্রণ	: ১৯৫৫
তৃতীয়	পরিমার্জিত	মুদ্রণ	: ১৯৬০
চতুর্থ	পরিমার্জিত	মুদ্রণ	: ১৯৬৩
পঞ্চম	পরিমার্জিত	মুদ্রণ	: ১৯৬৫
ষষ্ঠ	পরিমার্জিত	মুদ্রণ	: ১৯৬৬
সপ্তম	পরিমার্জিত	মুদ্রণ	: ১৯৬৬
অষ্টম	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৬৭
নবম	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৬৭
দশম	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৬৮
একাদশ	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৬৮
দ্বাদশ	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৬৯
ত্রয়োদশ	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৬৯
চতুর্দশ	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৭১
পঞ্চদশ	পরিমার্জিত	সংস্করণ	: ১৯৭২

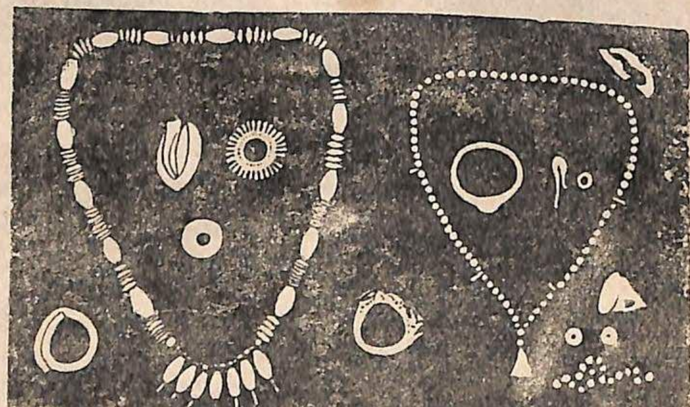
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

সংশো...
ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পারা যায়। পৃথিবীর নানা স্থান খুঁড়িয়া নানা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কোথাও হয়তো মাটির নীচে একটি বড় শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। সেই সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে তখনকার ঘর-বাড়ি কিরূপ ছিল, সেগুলি কিভাবে তৈয়ার করা হইত ইত্যাদি নানা খবর জানিতে পারা যায়। এইভাবে

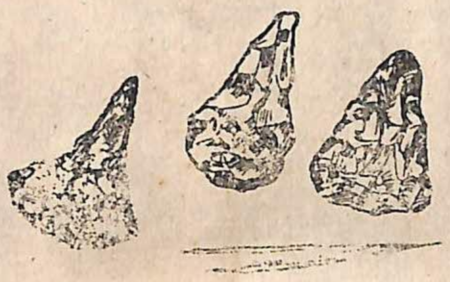


চিত্র ১ : মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ (মহেঞ্জোদরো)



চিত্র ২ : মাটির নীচ হইতে পাওয়া প্রাচীন অলংকার (মহেঞ্জোদরো)

মাটির নীচ হইতে অতি প্রাচীনকালের অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, পাথরের খোদাইকরা ছবি বা মূর্তি ইত্যাদি নানা জিনিস পাওয়া গিয়াছে। পাথরের অতি সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা ধাতুনির্মিত



চিত্র ৩ : পাথরের সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র

জিনিসপত্রও পাওয়া গিয়াছে। নানা স্থানের গুহায় আঁচড় কাটিয়া বা রং দিয়া মানুষ নানারকমের পশুপাখির ছবি আঁকিয়াছে, এইরূপও চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রাচীনকালের মানুষ কি রকমের বাসনপত্র ব্যবহার করিত, তাহারও চিহ্ন নানাস্থানের কবর হইতে বাহির করা হইয়াছে। গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশে মৃতের কবরের মধ্যে নিত্য ব্যবহারের নানাপ্রকার জিনিস-



চিত্র ৪ : প্রাচীন মুদ্রা

পত্রও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল চিহ্ন এবং ঘর-বাড়ি, মন্দির, রাস্তাঘাট, কূপ, নালা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ হইতে আমরা পুরাতন ইতিহাস গড়িতে পারি। ঐতিহাসিকগণ এই সকল চিহ্ন, ভগ্নাবশেষ, জিনিসপত্র ইত্যাদি কোন্ সময়ের হইতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিয়াছেন।

প্রাচীনকালের মানুষ গুহার গায়ে, পাথরে, স্তূপ বা স্তম্ভের গায়ে নিজেদের ভাষায় অনেক কথা খোদাই করিয়া গিয়াছে। মাটির নীচে এইরূপ বহু প্রাচীন লেখা পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সম্রাট্ অশোক তাঁহার

দাম : ২·০০

ডিস্ট্রিবিউটর্স
ওরিএণ্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স
কলিকাতা ১২ : নতুন দিল্লী ১

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র

মানব-ইতিহাসের ধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

প্রাচীনকালের ইতিহাস জানিবার উপায় :

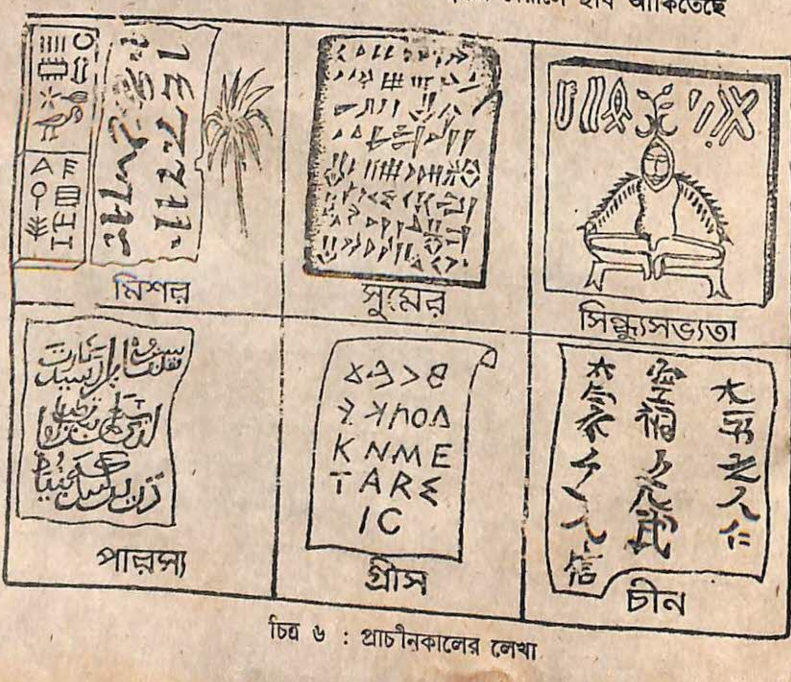
আজকাল তোমরা ইতিহাসের বই পড়। দেশ-বিদেশের কত কথা আজ তোমরা ছাপা বই পড়িয়া জানিতে পার। প্রতিদিন পৃথিবীর নানাদেশের নানা ঘটনার কথা খবরের কাগজে পড়িয়া জানিতে পার। অথবা তোমাদের মা, বাবা কিংবা দাদার আলাপ-আলোচনা শুনিয়া জানিতে পার। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে ত' আর ছাপাখানা ছিল না, কাগজও ছিল না। ঐ সময় ইতিহাস পড়িবার বা লিখিবার কথা কেহ ভাবিতও না। তাই প্রাচীনকালের ইতিহাস কিভাবে জানা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই জাগিবে।

আচ্ছা, মনে কর, তোমাদের বাড়িতে অনেক দিনের পুরানো কতকগুলি বই, আসবাবপত্র ইত্যাদি আছে। সেগুলির চেহারা বা গড়ন এখনকার বই বা আসবাবপত্রের মত নহে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার মা অথবা বাবাকে এই পুরানো ধরনের জিনিসগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিবে। হয়তো তোমার বাবা এই জিনিসগুলি কাহার ছিল, কোথায় কেনা হইয়াছিল ইত্যাদি অনেক কথা বলিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া তুমি হয়তো জানিতে পারিলে যে, তোমার ঠাকুরদা'র আসবাবপত্রের খুব শখ ছিল। তিনি এইগুলি বহু টাকা খরচ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তৈয়ার করাইয়াছিলেন। তিনি বই পড়িতেও খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার বইগুলি সবই ধর্মবিষয়ক। তুমি হয়তো তোমার ঠাকুরদা'কে দেখ নাই। কিন্তু এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া তোমার মনে তাঁহার ধর্মভাব, আসবাবপত্রের শখ ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মিবে। আবার আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে লোকে কি রকমের আসবাবপত্র ব্যবহার করিত, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিবে। সেই সকল জিনিসপত্র এখনকার জিনিসপত্র হইতে ভাল না মন্দ, সেই তুলনাও তুমি করিতে পারিবে। এইভাবে প্রাচীনকালের ইতিহাসও জানা সম্ভব।

প্রাচীনকালের মানুষের ব্যবহারের যে সকল জিনিসপত্র বা চিহ্ন মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের জীবনযাপনের প্রণালী কি ছিল, কি কি জিনিস তাহারা ব্যবহার করিত, ইত্যাদি অনেক কিছুই জানিতে



চিত্র ৫ : আদিম মানুষ আঁচড় কাটিয়া গুহার দেয়ালে ছবি আঁকিতেছে



চিত্র ৬ : প্রাচীনকালের লেখা

বাণী পাথরের গায়ে খোদাই করাইয়া গিয়াছিলেন। এইগুলি হইতে অশোকের জীবন, তাঁহার আদর্শ, ধর্মমত, তাঁহার শাসন প্রভৃতি সম্পর্কে বহু কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীনকালের ভাষা আমরা জানি না। কিন্তু ঐতিহাসিকরা



চিত্র ৭ : বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে মাটির নীচ হইতে পাওয়া পাথরের যন্ত্রপাতি

বহু পরিশ্রম করিয়া এই সকল ভাষা শিখিয়াছেন এবং প্রাচীন লিপি পাঠ করিয়া তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীনকালের মুদ্রা হইতেও ঐ সময়ের নানা ঘটনার তারিখ জানা গিয়াছে। কখনও কখনও বা ঐগুলি হইতে যে রাজা মুদ্রা তৈয়ার করাইয়াছিলেন, তাঁহার রুচি ও ধর্ম সম্বন্ধে জানা সম্ভব হইয়াছে।

প্রাচীনকালে ত' আর কাগজ ছিল না। তখন মানুষ পাথরে খোদাই করিয়া বা মাটির এক প্রকার পাত্‌লা ইটের উপর আঁচড় কাটিয়া লিখিত। কোন কোন দেশের লোক চামড়ার উপর লিখিত, আবার কোন দেশে তালগাছ বা অপর নানা গাছের পাতায় লিখিত। মিশর দেশে 'প্যাপিরাস' নামে এক রকম নল-খাগড়া-জাতীয় গাছের পাতায় লেখা হইত। এই প্যাপিরাস নাম হইতেই কাগজের ইংরাজী নাম হইয়াছে 'পেপার' (Paper)। এইভাবে বিভিন্ন দেশে নানা প্রকারের গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা তাহাদের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারি। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ হইল বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। এগুলি হইতেও আমরা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক খবর পাই।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে কিভাবে প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানিয়াছি, তাহা প্রাচীন মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। আমরা কেবলমাত্র একটা মোটামুটি ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক জিনিসপত্র, ধ্বংসাবশেষ, চিহ্ন ইত্যাদি মাটির নীচ হইতে পাওয়া যাইবে। মাত্র অল্প কাল আগে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে মাটির নীচ হইতে অতি প্রাচীন যুগের পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। বড় হইয়া তোমাদের মধ্যেই হয়তো কেহ কেহ প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করিয়া নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবে। তুমি বড় হইয়া ঐতিহাসিক হইবে কি?

আলোচনা

১। প্রাচীনকালের ইতিহাস আমরা কিভাবে জানিতে পারি?

২। প্রাচীনকালের মুদ্রা হইতে ঐতিহাসিকরা কি কি বিষয় জানিতে পারিয়াছেন?

৩। প্রাচীনযুগের মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র কিভাবে আবিষ্কৃত হয় এবং সেগুলি কি কি?

৪। প্রাচীনকালের মানুষ তাহাদের ভাষা কিভাবে প্রকাশ করিত?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদিম মানুষ : মানুষের বিভিন্ন জাতি

আজকাল পৃথিবীতে যেন লোক ধরে না। কিন্তু পৃথিবী যখন প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল তখন তাহাতে মানুষ কেন, কোন রকমের প্রাণী বা গাছপালাও ছিল না। পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছিল বড় অদ্ভুত ভাবে। আকাশে তোমরা যে অসংখ্য তারা দেখিতে পাও, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ, এমন কি কোটি কোটি গুণ বড়। এই তারাগুলি খুব পাশাপাশি আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধান আছে। এই তারাগুলি আগুনের গোলার মত শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় দুই শত কোটি বছর আগের ঘটনা। একটি বড় তারা আমাদের সূর্যের নিকট আসিয়া পড়ে। এই বিরাট তারার আকর্ষণের ফলে সূর্যের গায়ের অংশ ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সূর্যের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। এইগুলিকে গ্রহ বলা হয়। আমাদের পৃথিবী ইহাদের একটি।

সূর্য আগুনের বলের মতো একটি বিরাট জিনিস। ইহার অংশ যখন প্রথম পৃথক হইয়া পড়িল, তখন সেই অংশগুলিও অত্যন্ত গরম ছিল। তাই বহুকাল পর্যন্ত পৃথিবীও খুব গরম ছিল।



চিত্র ৮ : প্রাচীনকালের বৃহৎ আকারের প্রাণী (পৃথিবীর বুক হইতে লোপ পাইয়াছে)



চিত্র ৯ : হ্রদ-মানুষ মাছ শিকার করিতেছে

কিন্তু ক্রমে উহা ঠান্ডা হইল। ঠান্ডা হইবার পর পৃথিবীতে প্রথম জীবনের চিহ্ন দেখা দিল।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রাণী ছিল 'জেলি'র (jelly) মতো একটা তলতলে পদার্থ। ইহা জলের উপর ভাসিত। ক্রমে ইহা হইতে গাছপালা ও মাছের সৃষ্টি হইল। জলে যে সব গাছপালা জন্মাইল, তাহা হইতে ক্রমে স্থলের গাছপালারও সৃষ্টি হইল। আবার মাছ হইতে ক্রমে পাখি এবং উভচর প্রাণীর সৃষ্টি হইল। উভচর প্রাণী হইতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর সৃষ্টি হইল। প্রাচীন জীবজন্তু অত্যন্ত বৃহৎ আকারের ছিল। তাহাদের অনেকগুলিই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বুক হইতে লোপ পাইয়াছে। তবে তাহাদের কঙ্কাল নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। নানাদেশের যাদুঘরে ঐরূপ বৃহৎ আকারের প্রাণীর কঙ্কাল রাখা হইয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরেও প্রাচীনকালের বিরাট জন্তুর কঙ্কাল রাখা হইয়াছে। তোমরা অনেকে হয়তো তাহা দেখিয়া থাকিবে।

স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতে ক্রমে বানরজাতীয় একপ্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হইল। এইরূপ প্রাণীর একটি শাখা হইতে একদিন মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে।

মানুষ প্রথমে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতোই দল বাঁধিয়া বনে-জঙ্গলে বা জলাশয়ের ধারে বাস করিত। তাহারা পশুপাখি শিকার করিয়া, মাছ ধরিয়া, বা বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া ফলমূল যোগাড় করিয়া খাইত। তাহারা সাধারণত গাছের উপরে, গুহার মধ্যে বা হ্রদের জলে কোন রকমের একটা চালা বাঁধিয়া বাস করিত। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য তাহারা এইভাবে বাস করিত। এক জায়গার জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার শিকার করিতে করিতে ফুরাইয়া গেলে বা কোন জলাশয়ের সব মাছ শেষ হইয়া গেলে তাহারা অন্যত্র যাইত। প্রথমে তাহারা দাঁত এবং হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে মাংস বা মাছ ছিঁড়িয়া লইয়া কাঁচা খাইত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিও বাড়িল। ক্রমে তাহারা প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজেদের কাজে খাটাইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা এবং বুদ্ধিতে প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। বুদ্ধির সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইতে গিয়া মানুষ সর্বপ্রথম আগুন জ্বালিতে শিখিল। গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে বনে স্বাভাবিকভাবে আগুন জ্বলিত। প্রথমে তাহারা এইভাবে জ্বলা আগুনই সংগ্রহ করিত। সেই আগুন তাহারা দীর্ঘকাল জ্বালাইয়া রাখিত, নিবিতে দিত না। পরে তাহারা কাঠে কাঠে বা পাথরে পাথর ঠুকিয়া নিজেরাই আগুন জ্বালিতে শিখিল। তোমরা চকমকি পাথরের কথা অনেকেই হয়তো জানো। চকমকি পাথর

ঠুকিয়া আগুন জ্বালা হয়। আগুন জ্বালিতে শেখার ফলে তাহারা খাদ্যদ্রব্য প্রথম প্রথম পুড়াইয়া ও পরে রাঁধিয়া খাইতে শিখিল।



চিত্র ১০ : মানুষ আগুন জ্বালাইতে শিখিয়াছে

ক্রমে ক্রমে মানুষ শীত হইতে বাঁচিবার জন্য পশুর চামড়ার সাহায্যে শরীর ঢাকিতে এবং পাথর দিয়া নানারকম অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে শিখিল। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহারা পশু শিকার করিত বা পশুর আক্রমণ হইতে নিজেদের বাঁচাইত। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহারা উন্নত ধরনের পাথরের অস্ত্র তৈয়ার করিতে শিখিল। ক্রমে মানুষ পশু শিকার ছাড়িয়া পশুপালন আরম্ভ করিল। গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশু তাহারা চরাইত এবং সেগুলির মাংস ও দুধ খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত। পশুর চামড়া দিয়া পোশাক এবং তাঁবু তৈয়ার করিত। তখনও তাহাদের কোনও স্থায়ী ঘরবাড়ী ছিল না। তাহারা ছিল যাযাবর। এক স্থানের ঘাস ইত্যাদি পশুর খাদ্য শেষ

হইয়া গেলে তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইত। এই যুগের নাম প্রাচীন প্রস্তর যুগ। ক্রমে মানুষ চাষ করিতে শিখিল। বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ করিতে গিয়া মানুষ যখন দেখিল যে, বীজ হইতে গাছ জন্মায় তখন তাহারা বীজ সংগ্রহ করিয়া কৃষির কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষিকার্য আরম্ভ হইলে পর তাহারা একই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে বাধ্য হইল। তাহারা গরু,



চিত্র ১১ : মানুষ পাথরের সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র হইতে ক্রমে উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে শিখিল

ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি নানারকমের পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিল। যখন ফলমূল কুড়ানো বা পশু শিকারের উপর তাহারা নির্ভর করিত, তখন কোনদিন বা তাহাদের প্রচুর খাওয়া জুটিত, আবার কোনদিন বা তাহাদিগকে উপবাসে কাটাইতে হইত। কৃষি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য পাইবার অনিশ্চয়তা হইতে তাহারা রক্ষা পাইল। এখন তাহারা নিজেরাই যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করিতে লাগিল। গৃহপালিত পশু হইতে দুধ, মাংস ইত্যাদি পাইতে

লাগিল। ক্রমে তাহারা কাপড় বুনিতে ও মাটির বাসন তৈয়ার করিতে শিখিল। এইভাবে দিন দিন তাহারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা তামা, ব্রোঞ্জ্ প্রভৃতি নানা রকমের ধাতুর ব্যবহারও শিখিল। প্রথমে তাহারা তামা আগুনে দিলে গলিয়া যায় দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, পরে ইহাকে আগুন দ্বারা গলাইয়া নানাভাবে ব্যবহার করিতে শিখিল। এই যুগকে নব-প্রস্তর যুগ বলা



চিত্র ১২ : আগুনে দিলে তামা গলিয়া যায় দেখিয়া
মানুষ অবাক্ হইয়া গেল

হয়। অবশ্য, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা অতি সহজে দুইচারি কথায় এই সকল পরিবর্তনের ইতিহাস বলিতেছি, কিন্তু এই সকল পরিবর্তন ঘটিতে হাজার হাজার বছর লাগিয়াছিল।

এইভাবে হাজার হাজার বছরের পরিবর্তনের ফলে মানুষ নানা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিতে শিখিল। তাহারা একে অপরকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখিল। এইভাবে ভাষার উৎপত্তি হইল। তাহারা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি হইতে উপকার পাইত—যেমন সূর্যের আলো, বৃষ্টি, আগুন ইত্যাদি, অথবা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি তাহাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি

হইয়া গেলে তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইত। এই যুগের নাম প্রাচীন প্রস্তর যুগ। ক্রমে মানুষ চাষ করিতে শিখিল। বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ করিতে গিয়া মানুষ যখন দেখিল যে, বীজ হইতে গাছ জন্মায় তখন তাহারা বীজ সংগ্রহ করিয়া কৃষির কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষিকার্য আরম্ভ হইলে পর তাহারা একই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে বাধ্য হইল। তাহারা গরু,



চিত্র ১১ : মানুষ পাথরের সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র হইতে ক্রমে উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে শিখিল

ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি নানারকমের পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিল। যখন ফলমূল কুড়ানো বা পশু শিকারের উপর তাহারা নির্ভর করিত, তখন কোনদিন বা তাহাদের প্রচুর খাওয়া জুটিত, আবার কোনদিন বা তাহাদিগকে উপবাসে কাটাইতে হইত। কৃষি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য পাইবার অনিশ্চয়তা হইতে তাহারা রক্ষা পাইল। এখন তাহারা নিজেরাই যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করিতে লাগিল। গৃহপালিত পশু হইতে দুধ, মাংস ইত্যাদি পাইতে

লাগিল। ক্রমে তাহারা কাপড় বুনিতে ও মাটির বাসন তৈয়ার করিতে শিখিল। এইভাবে দিন দিন তাহারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি নানা রকমের ধাতুর ব্যবহারও শিখিল। প্রথমে তাহারা তামা আগুনে দিলে গলিয়া যায় দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল, পরে ইহাকে আগুন দ্বারা গলাইয়া নানাভাবে ব্যবহার করিতে শিখিল। এই যুগকে নব-প্রস্তর যুগ বলা

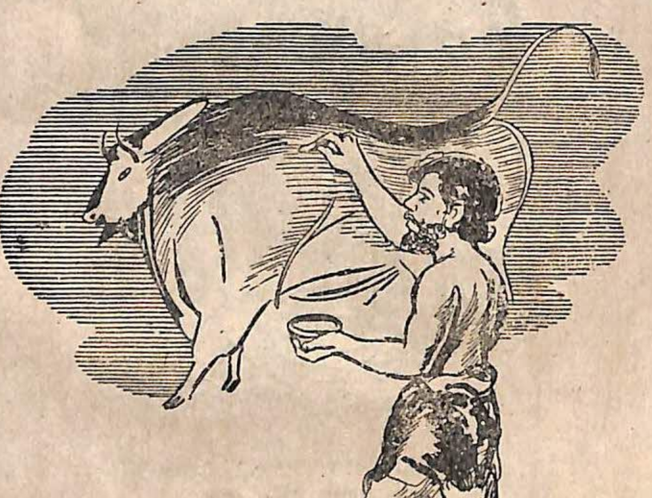


চিত্র ১২ : আগুনে দিলে তামা গলিয়া যায় দেখিয়া
মানুষ অবাক্ হইয়া গেল

হয়। অবশ্য, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা অতি সহজে দুইচারি কথায় এই সকল পরিবর্তনের ইতিহাস বলিতেছি, কিন্তু এই সকল পরিবর্তন ঘটিতে হাজার হাজার বছর লাগিয়াছিল।

এইভাবে হাজার হাজার বছরের পরিবর্তনের ফলে মানুষ নানা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিতে শিখিল। তাহারা একে অপরকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখিল। এইভাবে ভাষার উৎপত্তি হইল। তাহারা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি হইতে উপকার পাইত—যেমন সূর্যের আলো, বৃষ্টি, আগুন ইত্যাদি, অথবা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি তাহাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি

করিত, সেইগুলিকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা নানাভাবে পূজা, মন্ত্র-পাঠ ইত্যাদি করিতে শুরু করিল। এইভাবে ধর্মের উৎপত্তি হইল। মনের শক্তি যতই বাড়িতে লাগিল, মানুষ ততই নানাদিক দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দেয়ালের গায়ে তাহারা আঁচড় কাটিয়া ছবি আঁকিতে শিখিল। তাহারা মাটির পাত্রের উপর কারুকার্য করিতে লাগিল। সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার এবং নানাভাবে তাহাকে রূপ দিবার শক্তি তাহাদের জন্মিল। মাটির পাত্র, পোশাক, দেয়াল-চিত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি নানা জিনিসের মধ্যে তাহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান প্রকাশ পাইল। স্পেনের আল্টামিরা গুহার দেয়ালে রং-করা বহু হাজার বছরের প্রাচীন ছবি পাওয়া গিয়াছে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মানুষ আজ



চিত্র ১৩ : আল্টামিরা গুহার দেয়ালে রং-করা ছবি আঁকা হইতেছে

উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছে। অবশ্য পৃথিবীর সকল স্থানের মানুষের উন্নতি একই ভাবে একই গতিতে হয় নাই।

পৃথিবীর সকল জাতির মানুষ একই মূল জাতি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া বেশির ভাগ পণ্ডিত মনে করেন। বহুকালের এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে মানুষের চেহারা ও রঙের পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

গরম দেশে যাহারা বাস করিতে লাগিল, রৌদ্রতাপে তাহাদের রং হইল কালো, যাহারা শীতের দেশে বসবাস করিতে লাগিল তাহারা হইল সাদা। যেমন, আফ্রিকার গরমে নিগ্রো জাতির লোকের গায়ের রং কালো হইয়াছে, আবার বিলাতের ঠান্ডায় সাহেবদের রং সাদা হইয়াছে। আবার কালোও নহে, সাদাও



চিত্র ১৪ : সাদা রংয়ের মানুষের চেহারা (ইওরোপের লোক)



চিত্র ১৫ : কালো রংয়ের মানুষের চেহারা (আফ্রিকার লোক)



চিত্র ১৬ : হলদে রংয়ের মানুষের চেহারা (চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের লোক)

নহে, এমন এক জাতির লোক আছে। তাহাদের রং মোটামুটি হল্‌দে। যেমন, চীনদেশের লোকেরা।

পৃথিবীর মানুষকে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—(১) সাদা, (২) কালো এবং (৩) হল্‌দে।

ইওরোপের লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। ইহাদের গায়ের রং সাদা, চোখ কটা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আফ্রিকা অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের রং কালো, চুল খুব কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক চীন, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বাস করে। ইহাদের চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রং হল্‌দে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণকে প্রথম শ্রেণীতে ধরা হয়। বর্তমান ভারতীয়গণ এক মিশ্রিত জাতি। অবশ্য কোন দেশের লোকের মধ্যেই খাঁটি এক জাতির রক্ত পাওয়া এখন অসম্ভব।

আলোচনা

১। প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করিত? তাহাদের খাদ্য ও বাসস্থান কিরূপ ছিল? (M.E. 1970)

২। মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৩। কৃষি আরম্ভ হওয়ার আগে মানুষ কিভাবে জীবনধারণ করিত?

৪। মানুষকে মোটামুটি কয়টি জাতিতে ভাগ করিতে পারা যায়? এই সকল জাতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(১) পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রাণী ছিল—মতো একটা তলতলে—। (২) উভচর প্রাণী হইতে—প্রাণীর সৃষ্টি হইল। (৩) প্রাচীনকালের মানুষ আগুন জ্বালিতে শেখার পরে তাহারা খাদ্যদ্রব্য প্রথম প্রথম—ও পরে—খাইতে শিখিল।

৬। প্রাচীন মানুষের ধর্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। আদিম যুগের মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল? এই মানুষেরা কিভাবে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে আগাইয়া আসিয়াছিল লিখ। (M.E. 1968)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ

মিশর, মেসোপটামিয়া, সিন্ধু-উপত্যকা ও চীন :

কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের প্রণালী একেবারে অন্যরূপ হইয়া গেল। তাহারা এখন খাদ্য আহরণের পরিবর্তে খাদ্য উৎপাদন করিতে লাগিল। কৃষি-কার্যের জন্য একস্থানে স্থায়িভাবে বাস করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই তাহারা স্থায়ী এবং ভাল ঘর-বাড়ি তৈয়ার করিতেও আরম্ভ করিল। এক জায়গায় অনেক লোক বসবাস করিতে গেলে আইন-কানুন, রীতিনীতি, অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। এইভাবে প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া ক্রমে তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যও দেখা দিল।

কৃষির জন্য নদীর পাশের জমি খুবই উপযোগী। কেননা, জল না হইলে কৃষি চলে না। আবার মাটিও উর্বর হওয়া চাই। গৃহপালিত পশুর খাদ্য ঘাসও নদীর তীরেই বেশি জন্মে। তাই কৃষি ও পশুপালনের সুবিধার জন্য মানুষ বড় বড় নদীর তীরে বসবাস করিতে শুরু করিল। নদীর জলের পলিমাটি নদীর দুই ধারের জমিকে উর্বর করে। নদী হইতে খাল কাটিয়া চাষের জন্য জল নেওয়া যায়। এই সব সুযোগ-সুবিধার জন্য আজ হইতে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে মিশরের নীল নদের তীরে, মেসোপটামিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে, ভারতের সিন্ধু নদের তীরে, চীনদেশের ইয়াং সিকিয়াং এবং হোয়াংহো নদীর তীরে মানুষ প্রথম স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করিল।

মানুষ ক্রমে নানারকমের কাজকর্ম করিতে শিখিতে লাগিল। আদিম মানুষ সকলেই শিকার করিত বা পশুপালন করিত। কৃষি আবিষ্কারের পর কেহ কেহ কৃষিকার্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ ঘর-বাড়ি তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার কেহ কেহ কাপড় বোনা বা অন্য কোন কাজ করিতে থাকিল। এইভাবে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর পড়িল। ক্রমে তাহারা বহু শহর, নগর ও প্রাসাদ গড়িয়া তুলিল।

ক্রমে তাহারা লিখিতেও শিখিল। প্রথম প্রথম তাহারা ছবি আঁকিয়া বা নানারকম চিহ্নের সাহায্যে লিখিত। একটি মানুষ—এই কথা লিখিতে গেলে প্রথমে তাহারা একটি মানুষের ছবিই আঁকিয়া দিত, অথবা মানুষের দুইটি

চোখ আঁকিয়া 'মানুষ' কথাটি বুঝাইত। ক্রমে তাহারা অক্ষরের সাহায্যে লেখা আবিষ্কার করিল। এই ভাবে মানুষ ক্রমেই সভ্যতার পথে আগাইয়া চলিল।

এখন আমরা সভ্যতার প্রথম বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিব।

মিশর :

মিশর দেশের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। মিশর দেশের নাম শুনিলেই মিশরের পিরামিডের কথা তোমাদের মনে পড়ে—নয় কি? এখন এই মিশর দেশের প্রাচীনকালের কথা কিছু বলিব।



চিত্র ১৭ : তৃতীয় থুথমস



চিত্র ১৮ : মিশরের জলহস্তী দেবতা

আফ্রিকা মহাদেশের নীল নদের দুই তীরে মিশর দেশ অবস্থিত। মিশরের সভ্যতা গঠনে নীল নদের দান অপরিসীম। তাই "মিশরের সভ্যতা নীল নদের দান"—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। মিশরের পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি। সেজন্য মিশরের আবহাওয়া খুব শুষ্ক এবং গরম। নীল নদের

তীরের জায়গাগুলি কিন্তু অন্যরকম। প্রতি বছর একবার করিয়া নীল নদে বন্যা হয়। এই বন্যার জলে দুই পাশের জমি ডুবিয়া যায়। ইহার ফলে সেই সকল জমিতে পলিমাটি পড়ে। পলিমাটি জমিকে উর্বর করে। সুতরাং কৃষির পক্ষে এই সকল জমি খুবই উপযোগী। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ নীল নদের তীরে বাস করিতে শুরু করে। মিশরের যাহা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ্ আছে, অথবা যাহা কিছু মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা সকলই নীল নদের তীরে। নীল নদের জল যদি তীরের জমিকে উর্বর না করিত, তাহা হইলে মিশর দেশে লোকের বাস করা সম্ভব হইত না। নীল নদ মিশরের প্রাণস্বরূপ।

মিশরের ইতিহাসের প্রথম দিকে—অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে—মিশর অনেকগুলি ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যেরই একজন করিয়া রাজা ছিলেন। প্রত্যেক রাজ্যেরই পৃথক রাজধানী ও পৃথক দেব-দেবী ছিল। ঐ সময়ে নীল নদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা প্রত্যেক রাজারই উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, নীল নদের জলের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিলে নীল নদের তীরের রাজ্যগুলিকে অধীন করা খুবই সহজ ছিল। এই নদীর জলের উপরই প্রত্যেক রাজ্যের লোকের প্রাণধারণ নির্ভর করিত। রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে কালক্রমে সমগ্র মিশর দেশ একই রাজার অধীনে আসিল। মিশরের রাজাকে 'ফারাও' বলা হইত। 'ফারাও' কথাটির মূল অর্থ হইল—"যিনি বড় বাড়িতে থাকেন।" মিশরের রাজাদের ঘর-বাড়ি স্বভাবতই সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ি হইতে অনেক বড় ছিল। এই কারণেই হয়তো তাঁহাদের নাম 'ফারাও' হইয়াছিল।

মিশরবাসীরা প্রায় দুই হাজার বছর স্বাধীনভাবে তাহাদের ফারাওদের অধীনে বাস করে। তারপর আরব হইতে একদল লোক মিশর আক্রমণ করে। ইহাদের জীবিকা ছিল মেষপালন। ইহাদিগকে 'হিক্‌সস্' বলা হয়। হিক্‌সস্-গণ মিশর জয় করিয়া কয়েক শত বছর সেখানে রাজত্ব করে। তাহারা খুব অত্যাচারী ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মিশরবাসীরা হিক্‌সস্‌দিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। হিক্‌সস্‌রা মিশরবাসীদের চেয়ে কম সভ্য ছিল। তবে তাহারা মিশরবাসীদিগকে ঘোড়ার ব্যবহার শিখাইয়াছিল।

হিক্‌সস্‌দিগকে তাড়াইবার পর মিশর আবার উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। হিক্‌সস্‌দের আক্রমণের আগে মিশরের ফারাওরা যুদ্ধ-বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁহারা যুদ্ধ-বিদ্যা এবং দিগ্বিজয়ের দিকে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন। দিগ্বিজয়ী রাজা হিসাবে তৃতীয় থুথ্‌মসের নাম বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় থুথ্‌মস্‌ ইতিহাসের সর্বপ্রথম দিগ্বিজয়ী রাজা। তিনি মিশরের নৌ-শক্তির উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার নৌবাহিনী নীল নদ ছাড়া ভূমধ্যসাগরেও চলাচল করিত। পরবর্তী কালে মিশর পর পর আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস ও রোমের অধীন হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরের শেষ রানী ছিলেন ক্লিওপাত্রা।

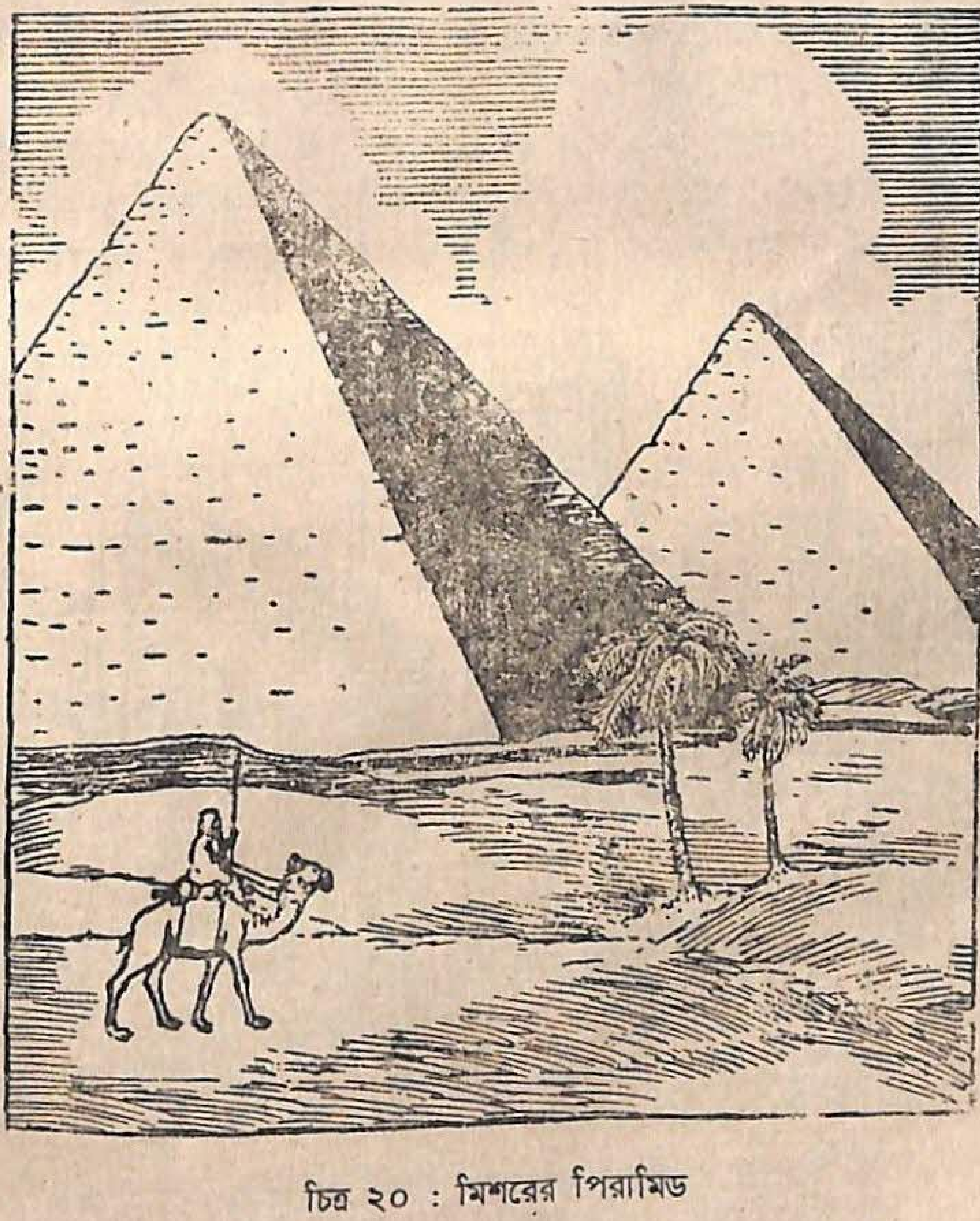
মিশরবাসীরা নানা নামের এবং নানাধরনের দেব-দেবীর পূজা করিত। তাঁহাদের মধ্যে রা, আমন এবং ওসিরিস্‌ ছিলেন প্রধান। ইহা ছাড়া, বিড়াল, কুমীর, ভেড়া, জলহস্তী ইত্যাদি নানারকমের জন্তু-জানোয়ারকেও তাহারা দেবতা বলিয়া পূজা করিত। সমাজে পুরোহিতের স্থান ছিল খুব উচ্চে। পুরোহিত শ্রেণীর লোককে চাষবাস বা অন্য কোনও পরিশ্রমের কাজ করিতে হইত না। কৃষকরা তাহাদের ফসলের এক অংশ পুরোহিতদিগকে দিয়া দিত। তাই পুরোহিতরা চিন্তা করিবার যথেষ্ট সময় পাইতেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর পরিবর্তন, আকাশের তারা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া এবং নানাবিষয়ে চিন্তা করিয়া নানা-প্রকার জ্ঞানলাভ করেন। এইজন্য মন্দিরগুলি বিদ্যা ও জ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।



চিত্র ১৯ : মিশরের 'মামি'

মিশরবাসীরা মনে করিত, মৃত্যুর পরও মানুষের জীবন শেষ হয় না। মানুষ আবার জীবন পায়। মৃতদেহ যদি ভাল-ভাবে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের পরবর্তী জীবনও ভাল হইবে। কেননা, শব যদি গলিয়া যায় বা পচিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ আবার দেহ পাইবে কি ভাবে? এইরূপ ধারণা তাহাদের ছিল বলিয়া তাহারা মৃতদেহ যাহাতে পচিয়া নষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা করিত। মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া লওয়া হইত। তারপর শবদেহ সোরার জলে ডুবাইয়া রাখা

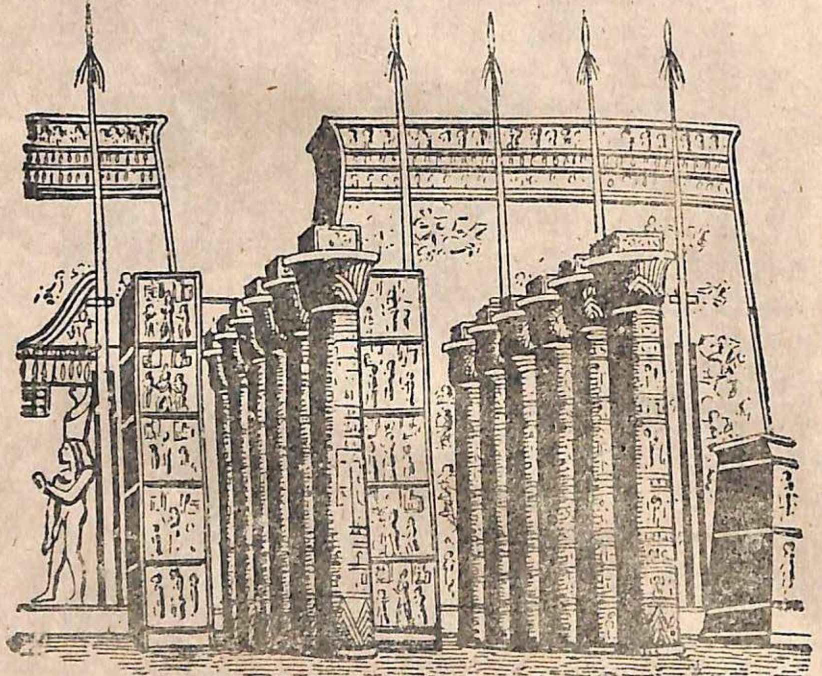
হইত। পরে দেহের মধ্যে পিচ ভরিয়া হাতির দাঁতের তৈয়ারি কৃত্রিম চক্ষু বসাইয়া সমস্ত শরীর তিন হইতে চারি ইঞ্চি চওড়া মসলিন-জাতীয় একরকমের পাতলা টেকসই কাপড় দিয়া জড়ানো হইত। ঐ কাপড়ের উপর পিচ মাখাইয়া পালিশ করিয়া দেওয়া হইত। তারপর মৃতদেহ কবর



চিত্র ২০ : মিশরের পিরামিড

দেওয়া হইত। এইরূপ সংরক্ষিত মৃতদেহকে 'মামি' বলা হয়। মৃতদেহের সঙ্গে নিত্য ব্যবহারের সব রকম জিনিসপত্র দেওয়া হইত। কেননা, মিশরীরা মনে করিত যে, পরবর্তী জীবনেও এই সকল জিনিস ব্যবহার

করিবার প্রয়োজন হইবে। 'মামির' সঙ্গে নানারকম মূল্যবান সামগ্রীও কবরে দেওয়া হইত। ফারাওদের কবরে স্বভাবতই অধিক মূল্যবান সামগ্রী থাকিত। পরবর্তী কালে প্রায় প্রত্যেক ফারাওয়ের কবর হইতেই এই সকল মূল্যবান জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন আগে টুটেন্খামেন নামে এক ফারাওয়ের কবর খুঁড়িয়া তাঁহার ব্যবহারের অনেক সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে। ইহাই একমাত্র কবর, যাহার কোন সামগ্রী চুরি যায় নাই। টুটেন্খামেনের কবর হইতে সোনায় মোড়া আরাম কেদারা, দুইটি বাক্স, তাঁহার দুইটি মূর্তি,



চিত্র ২১ : মিশরের কার্নাক্ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

ছড়ি, সোনায় মোড়া ধনুক ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার 'মামি' একের পর এক করিয়া তিনটি শবাধারের মধ্যে ছিল। ভিতরের শবাধারটি সোনা দিয়া তৈয়ারি ছিল। ইহা ছাড়া, নানারকমের মণি-মুক্তাও এই কবর হইতে

পাওয়া গিয়াছে। রাজার মৃতদেহ ছিল কাঁধ হইতে মাথা পর্যন্ত সোনার পাতে মোড়া।

মিশরের পিরামিডগুলি হইল ফারাওদের কবর। প্রত্যেক ফারাও নিজের রাজত্বকালে যে পরিমাণ অর্থ উদ্‌বৃত্ত হইত, তাহা সবই নিজের কবর তৈয়ার করিবার জন্য ব্যয় করিতেন। তাঁহারা মৃত্যুর আগেই কবর প্রস্তুত করিয়া যাইতেন। মিশরের তিনটি পিরামিড আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই তিনটি পিরামিড আজ হইতে পাঁচ হাজার বছর আগে পাথর দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহাদের সর্বোচ্চটিকে খুফু নামে এক ফারাও তৈয়ার করাইয়াছিলেন। এইটির উচ্চতা ৪৫০ ফুট এবং পরিধি ৭০০ ফুট। পিরামিড যখন তৈয়ার করা হইয়াছিল তখন ত' আর এখনকার মতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু তবুও তখনকার লোক প্রায় ৫ টন—অর্থাৎ ১৩৭২ মণ ওজনের পাথর কিভাবে যে ৪৫০ ফুট উঁচুতে তুলিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পাথরগুলিকে এমন সুন্দরভাবে জোড়া লাগানো হইয়াছে যে, আজও এই সকল পাথরের ফাঁকে একটি ছোট ছুরি ঢুকাইতে পারা যায় না। পিরামিড ভিন্ন অন্যান্য প্রকারের নির্মাণকার্যও মিশরবাসীদের জানা ছিল। আমন রা নামক দেবতার মন্দির হইতেও তাহাদের নির্মাণশিল্পের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। কার্নাক্ নামক স্থানে আমনের মন্দিরে খুব সুন্দর কারুকার্য-করা বহু স্তম্ভ ছিল। এইগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

মিশরবাসীরা কেবলমাত্র যে নির্মাণকার্যেই পারদর্শী ছিল তাহা নহে। তাহারা অতি সুন্দর মিহি কাপড়, মাটির পাত্র এবং নানা রংয়ের কাচের পাত্র তৈয়ার করিতে জানিত। চামড়া দিয়া জুতা ইত্যাদি নানাপ্রকারের সামগ্রীও তাহারা প্রস্তুত করিতে পারিত। ইট, কাঠ প্রভৃতির ব্যবহারও তাহারা জানিত। নৌবিদ্যা, কৃষি, খাল-খনন ইত্যাদিতে তাহারা অত্যন্ত পারদর্শী ছিল।

পুরোহিতরা শিক্ষকতার কাজ করিতেন। প্রতি মন্দিরের সঙ্গে বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। এইগুলিই ছিল তখনকার স্কুল। শিক্ষার উন্নতির মূলে পুরোহিতদের দান যথেষ্ট ছিল। তাঁহারাই প্রথম 'লিপির' ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে এই লিপি-চিত্রের দ্বারা লেখা হইত, অর্থাৎ নানা জিনিসের ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা হইত। ক্রমে এই সকল চিত্র অক্ষরের রূপ ধারণ করে। মিশরবাসীরা প্যাপিরাস নামক একরকম গাছের পাতায় লিখিত। ইহা ছাড়া, মিশরের সমাধি-সৌধগুলির গায়েও বহু লেখা খোদাই করিয়া রাখা হইত। এই সকল লিপি বহুকাল পর্যন্ত পাঠ

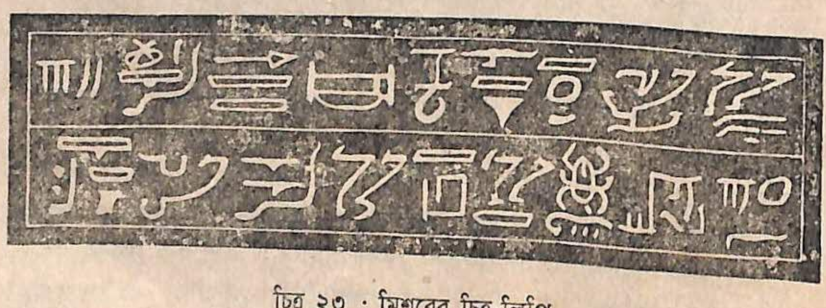
করা সম্ভব হয় নাই। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন মিশর জয় করিতে যান, তখন তাঁহার একজন সামরিক কর্মচারী সর্বপ্রথম মিশরীয় লিপির সহিত গ্রীক লিপির যে মিল আছে তাহা লক্ষ্য করেন। পরে স্যাম্পিলিয়ন (শাঁপিলিয়ঁ) নামে একজন ফরাসী অধ্যাপক অনেক চেষ্টা করিয়া মিশরীয় লিপি পড়িবার উপায় বাহির করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশরীয় লিপি পড়িতে সমর্থ হন। তিনি অবশ্য আর বেশিদিন বাঁচেন নাই। কিন্তু তিনি যে উপায় বাহির করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করিয়া মিশরীয় লিপি পাঠ করা এবং প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জানা সম্ভব হইয়াছে।



চিত্র ২২ : রং-করা মাটির পাত্র (মিশর)



চিত্র ২৪ : রং-করা সুমেরীয় মাটির পাত্র



চিত্র ২৩ : মিশরের চিত্র-লিপি

মেসোপটামিয়া :

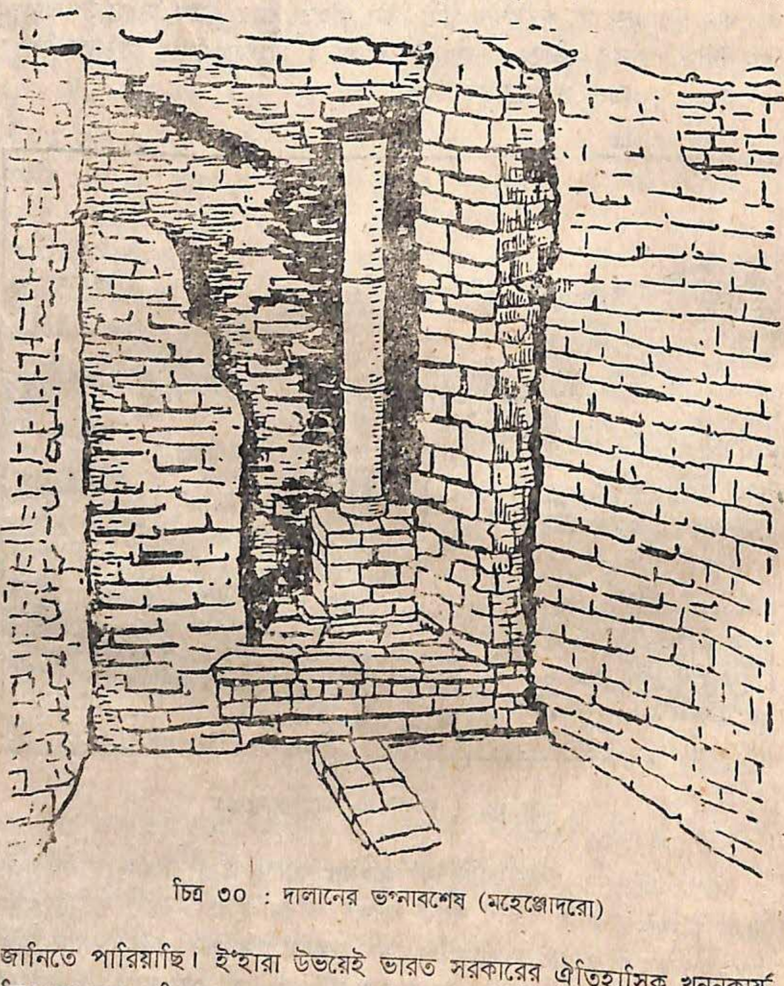
নীল নদের তীরে যেমন প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তেমনিই টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরেও এক প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল সুমের নামে পরিচিত। গ্রীকগণ এই স্থানের নাম দিয়াছিল মেসোপটামিয়া। মেসোপটামিয়া কথাটির অর্থ হইল 'দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল'। যে কারণে আদিম মানুষ নীল নদের তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণে—অর্থাৎ কৃষির সুবিধার জন্য—টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মানুষ বসবাস করিতে আরম্ভ করে।

প্রথমে সুমের বা মেসোপটামিয়া ঝিল, খাল ও জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল। সুমেরবাসীরা এই সকল জলাভূমি হইতে খাল, নালা খনন করিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করে। এইভাবে তাহারা এই অঞ্চলকে কৃষি এবং বসবাসের উপযোগী করিয়া তোলে। সুমেরীয়রা গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু পালন করিত। ঘোড়ার ব্যবহার তাহারা জানিত না। ক্রমে তাহারা ছোট ছোট শহর গড়িয়া তোলে। শহরগুলির প্রত্যেকটিই ছিল স্বাধীন। প্রত্যেক নগর-রাজ্যের নিজ নিজ দেব-দেবী, মন্দির ইত্যাদি ছিল। ক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র নগর-রাজ্যের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। সুমেরবাসীরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা। তাহারা কুঠার, বর্শা ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ করিত। তাহারা ঢাল ও ধাতু-নির্মিত শিরস্ত্রাণ বা টুপির মতো এক-রকম জিনিস ব্যবহার করিত। তাহাদের শিরস্ত্রাণ ছিল তামার তৈয়ারি।

সুমেরবাসীরাও মিশরীয়দের ন্যায় এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহারা কাপড় প্রস্তুত করিতে জানিত। কৃষিকার্যে তাহারা খুব পারদর্শী ছিল। তাহারা খাদ্যশস্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশের লোকদের সহিত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। মাটির একরকম পাতলা ইটের উপর আঁচড় কাটিয়া তাহারা লিখিত। এইরূপ লেখাযুক্ত বহু মাটির ইট বা টালি-জাতীয় জিনিস পাওয়া গিয়াছে। সুমের-বাসীরা ইট, মাটির পাত্র, মাটির মূর্তি প্রভৃতি অনেক কিছু তৈয়ার করিতে জানিত। তাহারা তাহাদের দেব-দেবীর জন্য ইট দিয়া উঁচু মন্দির নির্মাণ করিত। তাহারা নৌবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল।

সুমেরের প্রথম ইতিহাস ছিল বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। সুমের-বাসী বহুকাল অবধি পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর

উঁচু ঢিপি দেখিতে পান। তাঁহারা এইগুলিকে বৌদ্ধ স্তূপ মনে করিয়াছিলেন। এইগুলি খুঁড়িয়া তাঁহারা এক বিরাট এবং অতি প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ পাইয়াছেন। তাঁহাদের খননকার্যের ফলেই সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমরা



চিত্র ৩০ : দালানের ভগ্নাবশেষ (মহেঞ্জোদরো)

জানিতে পারিয়াছি। ইঁহারা উভয়েই ভারত সরকারের ঐতিহাসিক খননকার্য বিভাগে কাজ করিতেন। জন মার্শাল ছিলেন সেই বিভাগের অধিকর্তা।

সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা চিত্রের সাহায্যে লিখিতে জানিত। প্রায় পাঁচ শতেরও বেশি সীলমোহর সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। এই সকল সীল-

মোহর এ'টেল মাটি এবং বালি দিয়া তৈয়ার করা হইত। সেগুলির উপর অংকিত চিত্রলিপি এখনও পাঠ করা সম্ভব হয় নাই। তাই সিন্ধু সভ্যতার কালে রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে তাহাদের ঘর-বাড়ি, বাসন, অলঙ্কার ও মূর্তি ইত্যাদি হইতে ঐ সময়কার সভ্যতা সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি।

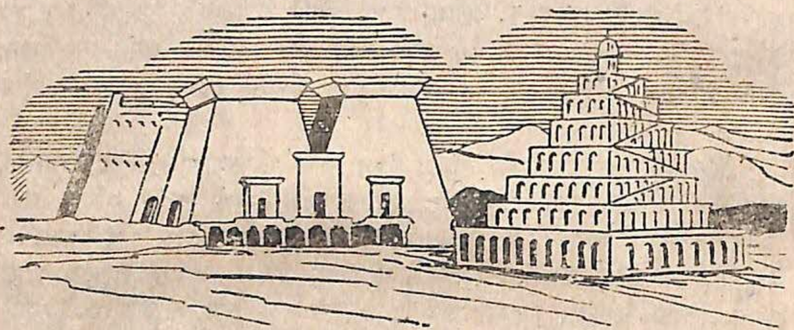


চিত্র ৩১ : সীলমোহর (মহেঞ্জোদরো)



চিত্র ৩২ : রং-করা মাটির পাত্র (মহেঞ্জোদরো)

আগে তাহারা অপর এক জাতির নিকট পরাজিত হইয়া স্বাধীনতা হারায়। এই নূতন জাতির লোকদের 'সেমিটিক' জাতির লোক বলা হয়। ইহাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল ব্যাবিলন। ব্যাবিলনও একটি নগর-রাজ্য ছিল। ক্রমে ইহা এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, সমগ্র মেসোপটামিয়া ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ব্যাবিলনের সভ্যতা অবশ্য সুমেরীয় সভ্যতা



চিত্র ২৫ : সুমেরীয় দালান

হইতে উন্নত ধরনের ছিল না। তাই সুমেরীয় সভ্যতার অনেক কিছুই ব্যাবিলনের লোকেরা গ্রহণ করে। এইভাবে ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়িয়া ওঠে এবং সমগ্র মেসোপটামিয়ায় বিস্তৃত হয়।



চিত্র ২৬ : হামুরাবি

ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে হামুরাবি ছিলেন খুব প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বড় যোদ্ধা এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। ইনিই ব্যাবিলন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার আমলে সমগ্র মেসোপটামিয়া ব্যাবিলনের অধীনে আসে। হামুরাবি তাঁহার সাম্রাজ্যের জন্য নানারকমের আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই সকল আইন তিনি একটি পাথরের

উপর খোদাই করাইয়া দিয়াছিলেন। এই পাথরটি এখনও আছে। হাম্মুরাবির আইন অনুসারেই ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালিত হইত।

হাম্মুরাবি ছাড়া ব্যাবিলনের অপর একজন রাজার নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইঁহার নাম দ্বিতীয় নেবুকাড্নেজার। তবে তিনি হাম্মুরাবির প্রায় দেড় হাজার বছর পরের লোক। নেবুকাড্নেজার ব্যাবিলন নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রানী এমাইটিস্‌কে খুশি করিবার জন্য পাথরের থামের উপর মাচা বাঁধিয়া একটি বিরাট বাগান তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যাবিলনের 'শূন্য উদ্যান' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বিজ্ঞান, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার (অর্থাৎ তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান)—উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।



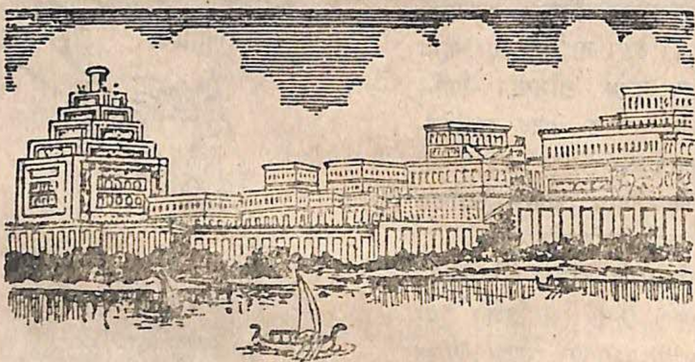
চিত্র ২৭ : নেবুকাড্নেজার

ব্যাবিলনের উত্তরে আর একটি সভ্যতাও দেখা দিয়াছিল। ইহা আসিরীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। আসিরীয়রা ব্যাবিলনীয় লোকদের ন্যায় সেমিটিক জাতির লোক ছিল। তাহাদের দেবতার নাম ছিল অসুর। এই দেবতার নাম হইতেই তাহারা নিজেদের আসিরীয় বা অসুরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দিত। আসিরীয় জাতির লোক নিনেভে নামে একটি নগর গড়িয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা ব্যাবিলন, মিশর ইত্যাদি সকল স্থানে তাহাদের রাজত্ব বিস্তার করে। তাহাদের পোশাক কাঁধ হইতে

পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ছিল। পুরুষরা লম্বা চুল এবং দাড়ি রাখিত।

আসিরীয় সৈন্যগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা : বর্শাধারী, তীরন্দাজ, অশ্বারোহী এবং রথারোহী সৈন্য। আসিরীয়গণের রাজা দ্বিতীয় সারগন্-ই সর্বপ্রথম লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। আসিরীয় সৈন্যরাই সর্বপ্রথম শত্রুর দুর্গ-প্রাচীর ভাঙিবার জন্য ঢেঁকির মতো একরকম যন্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। আসিরীয় সৈন্যরা ছিল অত্যন্ত নির্মম ও অত্যাচারী। তাহারা শত্রুকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, শত্রুর মৃতদেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিত।

আসিরীয় রাজাদের মধ্যে অসুর্‌বানিপালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার আমলে আসিরীয় সাম্রাজ্য যে কেবল বিস্তার লাভ করিয়াছিল এমন নহে, অন্যান্য নানাদিক দিয়াও তখন উন্নতি ঘটিয়াছিল। তিনি



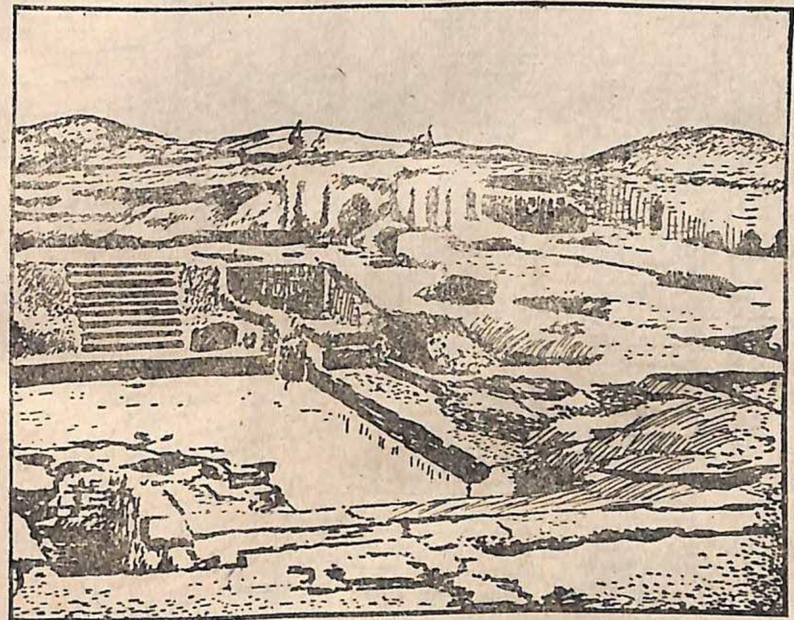
চিত্র ২৮ : নিনেভে

একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী নিনেভে নগরে এক বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এই গ্রন্থাগারে সুমের এবং ব্যাবিলনের বহু লিপি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ কুড়ি হাজার মাটির পাতলা টালি পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধু-সভ্যতা :

মিশর, মেসোপটামিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যখন সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন ভারতবর্ষের লোকেরা কি করিতেছিল? সিন্ধু দেশের মহেঞ্জোদরো

এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং বেলুচিস্থানের কয়েকটি জায়গা খুঁড়িয়া কতকগুলি ঐতিহাসিক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। যে সকল চিহ্ন এইসব স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে অনুমান করা হয় যে, খ্রীষ্টের প্রায় তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু-উপত্যকায় এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা মিশর ও সুমের সভ্যতার সমসাময়িক ছিল।



চিত্র ২৯ : স্নানাগার (মহেঞ্জোদরো)

আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তিনি 'বুকিফালা' এবং 'নিকাইয়া' নামে দুইটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুইটি শহর পাঞ্জাবে অথবা তাহার পাশাপাশি কোন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্যার জন মার্শাল এই দুইটি শহরের কোন ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা তাহার খোঁজ করিতে যান। তাঁহারা পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদরোতে কতকগুলি

যে সকল দালান-কোঠা মাটির নীচ হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে, সেইগুলির গঠন-কৌশল দেখিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। ছোট ছোট দালান হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বড় দালানের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। শহরের নর্দমাগুলি ঢাকা ছিল। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া ছিল। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দালান নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, সিন্ধু সভ্যতা একটি অতি উন্নত ধরনের শহুরে সভ্যতা ছিল।



চিত্র ৩৩ : মহাযোগী বা পশুপতি (মহেঞ্জোদরো)

দালানের দেয়ালে নানারকম ছবি পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি অতি সুন্দর মূর্তি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এখানের লোকেরা মৃৎশিল্পে পারদর্শী ছিল। মিশরের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য তাহারা সম্ভবত করিত।

সিন্ধু উপত্যকার লোক গম, যব, খেজুর, দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাইত। তাহারা সুতী এবং পশমের পোশাক পরিত। স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই

গহনা পরিতে ভালবাসিত। সোনা, রূপা, তামা, হাতির দাঁত, নানারকমের দামী পাথর তাহারা গহনার জন্য ব্যবহার করিত। সম্ভবত তহারা কুঠার, বর্শা, ছুরি ইত্যাদি দিয়া যুদ্ধ করিত। ঢাল, বর্ম বা সেইরূপ কোন আত্মরক্ষার অস্ত্র-শস্ত্র তখন ছিল না। কুকুর, ভেড়া, শূকর, ছাগল, গরু, হাতি প্রভৃতি ছিল তাহাদের গৃহপালিত পশু। ঘোড়া তখন ঐ অঞ্চলে পাওয়া যাইত না। লোহার ব্যবহারও তাহারা জানিত না। তাহারা এক মহাযোগী পুরুষ এবং এক মহা-মাতৃদেবীর পূজা করিত মনে হয়। এই মহাযোগী পুরুষ কতকটা হিন্দুদের পশুপতি শিবের মতো। সিন্ধু-উপত্যকায় কোনও মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, সিন্ধু-উপত্যকায় আজ হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা জগতের আদি সভ্যতাগুলির একটি। সুমের সভ্যতার সহিত এই সভ্যতার অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুমেরের লোকদের মতো সিন্ধু-উপত্যকার লোকেরাও পোড়া ইটের দালান নির্মাণ করিত। তাহা ছাড়া, সুমেরীয় কয়েকটি সীলমোহর সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এই দুই সভ্যতার মধ্যে যে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

চীন-সভ্যতা :

চীনদেশের হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে এক প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেশে যেমন প্রাচীনযুগের বহু কাহিনী-কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, চীনদেশেও অনেক প্রাচীন কাহিনী-কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই 'ভারতবর্ষ' নাম হইয়াছে। চীনদেশে কিংবদন্তী আছে যে, অতি প্রাচীনকালে বিশ্বজগতে যখন পৃথিবী, সূর্য কিছুই ছিল না, তখন চীনে পান্-কু নামে এক অতি-মানব জন্মগ্রহণ করেন। পান্-কু কথাটির অর্থ হইল 'প্রথম মানুষ'। ইনি আঠার হাজার বছর বাঁচিয়া ছিলেন। ইনি নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইনি মারা গেলে ইঁহার মাথা হইতে পাহাড়-পর্বত, শ্বাস হইতে বায়ু ও মেঘ, এবং কণ্ঠস্বর হইতে বজ্র, ও শরীরে যে-সকল জীবাণু ছিল তাহা হইতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি হইল।

চীনদেশে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীনকালে

চীনদেশে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ঐ পাঁচজন রাজা চীন জাতিকে সভ্য জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা চীনবাসীদিগকে গানবাজনা, ছবি আঁকা, রেশমের কাপড় প্রস্তুত করা, লেখাপড়া ইত্যাদি সব কিছু শিখাইয়াছিলেন। চীনদেশের কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে তাহাদের প্রাচীন রাজাদের নানা গুণ গরিমার কথা জানা যায়। তাহাদের একজন প্রাচীন রাজা তাহাদিগকে চুম্বকের ব্যবহার, ইটের দালান তৈয়ার করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করা শিখাইয়াছিলেন। অপর একজন রাজা চীনদেশের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া, বন্য জন্তু জানোয়ার তাড়াইয়া এবং বন্যার প্লাবন বন্ধ করিয়া কৃষির উন্নতি করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু কাহিনী-কিংবদন্তী চীনদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই সকল কাহিনীর সব কিছুই সত্য বলিয়া মনে করা ভুল।

সাঙ্ বা ইন্ বংশের সম্রাটগণের রাজত্বকাল হইতে চীনদেশের প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানিতে পারি। এই বংশের সম্রাটগণের রাজধানী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেগুলির ধ্বংসাবশেষ বহুকাল মাটির নীচে পড়িয়া ছিল। খনন করিবার পূর্বে মহেঞ্জোদরো যেমন 'মড়ার ঢিপি' নামে পরিচিত ছিল, সেইরূপ সাঙ্ বা ইন্ বংশের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপকে 'ইন্‌দের ঢিপি' বলা হইত। পরে এই ঢিপি খুঁড়িয়া ইন্ বংশের রাজত্বকালের চীনা সভ্যতার বহু চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল চিহ্নের মধ্যে কচ্ছপের শক্ত খোলের উপর খোদাই-করা নানারকমের ছবি আছে। চীনাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ জানিবার এক অদ্ভুত উপায় প্রচলিত ছিল। কচ্ছপের খোলার উপর প্রশ্ন খোদাই করিয়া দৈবের উদ্দেশ্যে রাখা হইত। পরে কচ্ছপের খোলাটি গরম করিলে ইহাতে নানাপ্রকার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। ঐ সকল চিহ্ন দেখিয়া চীনারা ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিত। ইহা "কচ্ছপের দৈববাণী" নামে পরিচিত। চীনা লিপিতে বহু লেখাও ঐসব খোলে পাওয়া গিয়াছে। মৃগয়ার চিত্র, কুকুর, ষাঁড়, শূকর ইত্যাদির ছবি আঁকা কতকগুলি কচ্ছপের খোলাও পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্রোঞ্জের, চীনা মাটির ও রং-করা মাটির পাত্র ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে চীনারা মৃত পূর্বপুরুষগণকে ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত।

সাঙ্ বা ইন্ বংশের পর চৌ বংশ রাজত্ব করে। এই বংশের প্রথম রাজার নাম উ-উয়াং। ইনি সাঙ্ বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করেন। পরাজিত হইয়া শেষ সাঙ্ রাজা আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। উ-উয়াং চীনা অভিজাত শ্রেণীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তিকেই তিনি কিছু পরিমাণ জমি দিয়াছিলেন। অভিজাতরা আবার সেই জমি

সাধারণ লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণ লোক তাহাদের জমিদারের আদেশ পালন করিতে বাধ্য ছিল। তাহারা জমিদারের জন্য মাছ ধরা, কাঠ কাটা, মাংস যোগাড় করা এবং পোশাক তৈয়ার করা প্রভৃতি নানাকাজ করিতে বাধ্য ছিল। বিশ বছর হইতে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে জমিদারের কাজ করিতে হইত। ষাট বছর বয়সের পর আর তাহাদিগকে জমিদারের কোন কাজ করিতে হইত না, জমিদারের নিকট হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহারা ভাতা পাইত।

চৌ সম্রাটগণ অভিজাত শ্রেণীকে বশে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে অভিজাতগণ একরকম স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। চৌ সম্রাটগণের আমলে অভিজাতগণকে নিয়মিতভাবে সম্রাটের দরবারে হাজির হইতে হইত। নিজ নিজ এলাকার কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাহারা সম্রাটকে জানাইতে বাধ্য থাকিত। চৌ সম্রাটগণ নিজেরাও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার সারা রাজ্য দেখিতে বাহির হইতেন। ঐ সময়ে তাঁহারা অপরাধী জমিদারদিগকে শাস্তি দিতেন এবং যাহারা সত্যি ভালভাবে নিজ নিজ এলাকার উন্নতি করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে নানারকম পুরস্কার দিতেন। চৌ বংশের রাজত্বকালেই চীনদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কন্‌ফুসিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল কং ফুৎসি। তিনি অবশ্য কন্‌ফুসিয়াস নামেই সর্বত্র পরিচিত। তাঁহার লেখা হইতে তখনকার চীনদেশের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানিতে পারি। ইঁহার সম্বন্ধে পরে আমরা আরও আলোচনা করিব।

আলোচনা

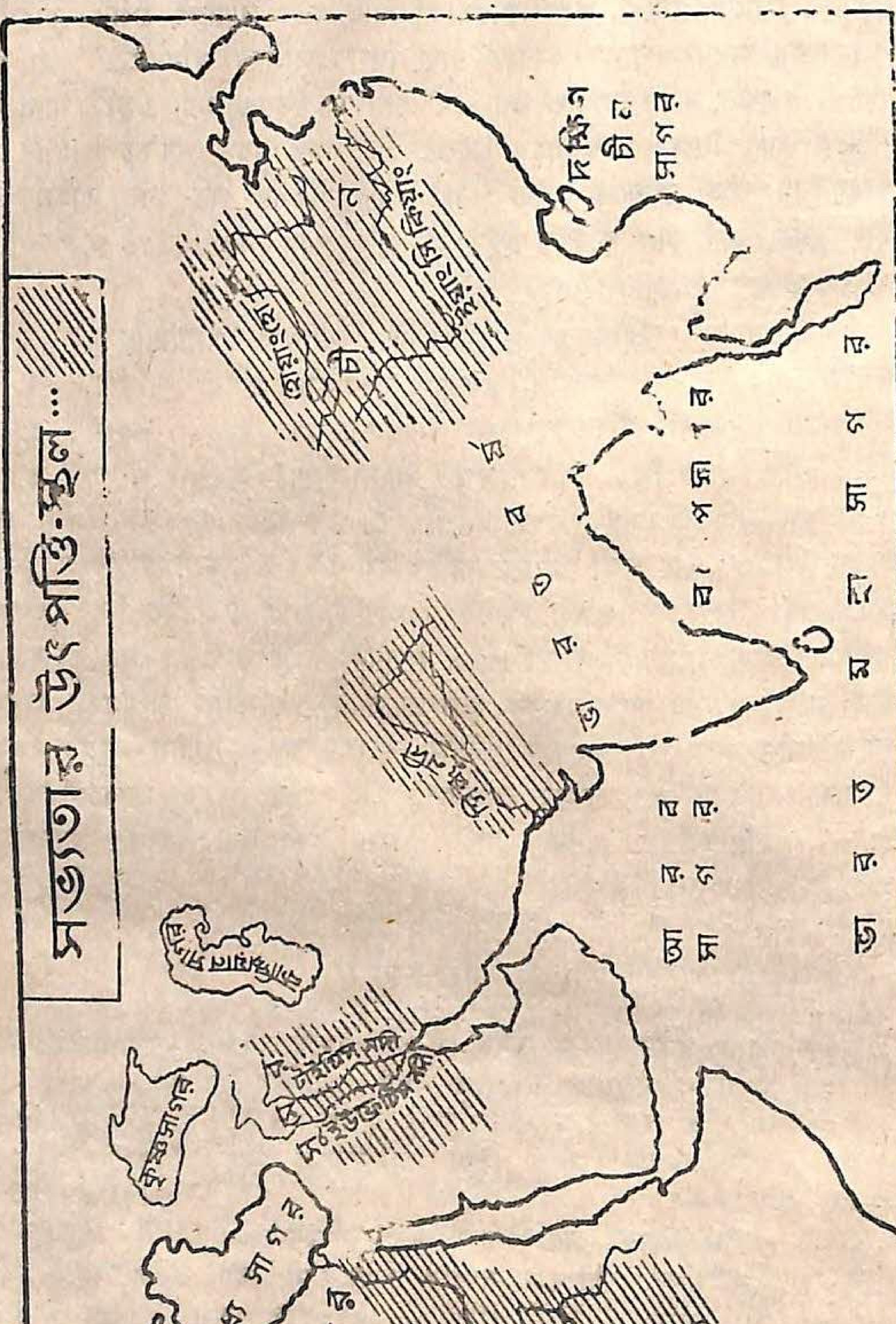
১। মানুষ প্রথমে নদীর তীরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল কেন?

২। 'মিশর নীল নদের দান'—এই কথার অর্থ বুঝাইয়া বল।

৩। মিশরীয় সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও [M.E. 1958] মিশর একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিয়াছিল কেন? মিশরীয় সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [M.E. 1960]

৪। প্রাচীন মিশরের ফারাওদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1961]

৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যাহা জান, অল্প কথায় লিখ :
(ক) 'মামি' [M.E. 1956], (খ) পেপিরাস, (গ) ফারাও, (ঘ) পিরামিড, (ঙ) থুথ্‌মস্, (চ) স্যাম্পিলিয়ঁ, (ছ) জরথুস্ত্র [M.E. 1955], (জ) মিশরীয় চিত্রলিপি [M.E. 1968], (ঝ) মেসোপটামিয়া [M.E. 1968], (ঞ) নেবুকাড্‌নেজার [M.E. 1968]



চিত্র ৩৪ : সভ্যতার উৎপত্তিস্থল

৬। সংক্ষেপে সুমেরীয় সভ্যতা বর্ণনা কর। [M.E. 1957]

৭। ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি এত প্রসিদ্ধ কেন?

৮। নেবুকাড্‌নেজার কে ছিলেন? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৯। অসুরবানিপালের সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ কাজ কি লিখ।

১০। সিন্ধু সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1956, 1969] সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [M.E. 1961]

১১। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার হইল কিরূপে? এই সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1959]

১২। চীন সভ্যতার ইতিহাসে সাঙ্‌ এবং চৌ বংশের দান কি ছিল?

১৩। টুটেনখামেনের কবর হইতে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস আবিষ্কৃত হয়?

১৪। 'কচ্ছপের দৈববাণী' কাহাকে বলে?

১৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(১) মানুষের দুইটি চোখ আঁকিয়া—কথাটি বুঝাইত। (২) আফ্রিকা মহাদেশের নীলনদের দুই তীরে—দেশ অবস্থিত। (৩) মিশরের রাজাকে—বলা হইত। (৪) হিক্‌সস্‌গণ খুব—ছিল এবং মিশরবাসীদের চেয়ে—ছিল। (৫) দিগ্বিজয়ী রাজা হিসাবে—নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (৬) সাঙ্‌ বংশের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপকে—বলা হইত। (৭) মিশরীয়রা যে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করিত তাহাদের মধ্যে—,— এবং—ছিলেন প্রধান।

১৬। 'মহেঞ্জোদরো' শব্দের অর্থ কি? মহেঞ্জোদরোর নাগরিকগণ কেমন জীবন যাপন করিত? এ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ। [M.E. 1968]

১৭। প্রাচীন মিশরীয়রা কোন্‌ কোন্‌ দেবতার উপাসনা করিত? কি উদ্দেশ্যে পিরামিড নির্মাণ করা হইয়াছিল? [M.E. 1967]

১৮। এক কথায় উত্তর দাও :

(১) প্রাচীন মিশরের শেষ রানীর কি নাম ছিল?

(২) মিশরের সর্বোচ্চ পিরামিডটি কে তৈয়ার করিয়াছিলেন?

(৩) কে এবং কত খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় লিপি পড়িতে সমর্থ হন?

(৪) মেসোপটামিয়া কথাটির অর্থ কি?

(৫) 'ফারাও' কথাটির মূল অর্থ কি?

সময় নির্দেশ

পৃথিবীর জন্ম		আজ হইতে প্রায় দুই শত কোটি বছর আগে
প্রকৃত মানুষের উৎপত্তি		আজ হইতে অন্ততঃ ৫০ হাজার বছর আগে
কৃষির আবিষ্কার		আজ হইতে প্রায় ৭ হাজার হইতে ১০ হাজার বছর আগে (খ্রীঃ পূঃ ৮,০০০—৫,০০০)
সভ্যতার উৎপত্তি		আজ হইতে প্রায় ৬ হাজার বছর আগে
মিশর :		খ্রীঃ পূঃ ৪০০০—৩০ খ্রীঃ পূঃ
(মিশরের প্রধান ফারাওগণ)		
খুফু	...	” ” ২৮৯৮—২৮৭৫ খ্রীঃ পূঃ
খাফ্রা	...	” ” ২৮৬৭—২৮১১ ” ”
মেনকরা	...	” ” ২৮১১—২৭৮৮ ” ”
হিক্‌সস্‌দের রাজত্বকাল	...	” ” ১৭৮৮—১৫৮০ ” ”
তৃতীয় থুথ্‌মস	...	” ” ১৪৭১—১৪৪৭ ” ”
ইথ্‌নাটন	...	” ” ১৩৭৫—১৩৫৮ ” ”
টুটেনখামেন	...	” ” ১৩৫৮—১৩৫৩ ” ”
ক্লিওপাট্রা (শেষ রানী)	...	” ” ৫১—৩০ ” ”
আসিরিয়া :		খ্রীঃ পূঃ ২৪০০—৬২২ খ্রীঃ পূঃ
সারগন (২য়)	...	” ” ৭২২—৬২২ ” ”
ব্যাবিলন :		খ্রীঃ পূঃ ২১২৫—৫৩৯ খ্রীঃ পূঃ
হাম্মুরাবি	...	” ” ২১২৩—২০৮০ ” ”
অসুরবানিপাল	...	” ” ৬৬৯— ৬২৬ ” ”
নেবুকাড্‌নেজার (২য়)	...	” ” ৬০৫— ৫৬২ ” ”
নেবুনিডাস	...	” ” ৫৫৬— ৫৩৯ ” ”
সিন্ধু সভ্যতা :		খ্রীঃ পূঃ ৩০০০—২০০০ খ্রীঃ পূঃ
চীন :		খ্রীঃ পূঃ ২৬০০— ২৫০ খ্রীঃ পূঃ
চীনা কিংবদন্তীর প্রথম পাঁচজন চীনা রাজা	...	” ” ২৭৩০—২৪০০ ” ”
সাঙ্‌ বা ইন্‌ বংশ	...	” ” ১৭৫০—১১২৫ ” ”
চৌ বংশ	...	” ” ১১২৫— ২৫০ ” ”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্যগণ ও আর্যসভ্যতা

আর্যগণ :

আর্য ভাষায় যাহারা কথা বলিত, তাহাদিগকেই আমরা আর্যজাতি বলিয়া থাকি। আর্যগণ প্রথম কোথায় বাস করিত, তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। কাহারও মতে, আর্যগণ প্রথমে মধ্য এশিয়ায় বাস করিত। আবার কেহ কেহ বলেন, তাহারা কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে বাস করিত। অপর একদল বলেন, আর্যগণ প্রথমে ইওরোপের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে বাস করিত। যাহা হউক, এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।

আর্যগণের ভাষা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি আলাদা আলাদা ভাষায় পরিণত হইয়াছে। গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, ফার্সি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আর্যভাষার অন্তর্গত। আর্যগণ তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে ক্রমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের এক শাখা পারস্য এবং ভারতবর্ষেও আসে। এইভাবে তাহারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতে থাকে এবং নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া তোলে। বিভিন্ন স্থানের এই সকল আর্য সভ্যতা সম্পর্কে এখন আলোচনা করিব।

ভারতের আর্য সভ্যতা বা বৈদেশিক সভ্যতা :

আর্যরা কখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তবে তাহাদের একটি শাখা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। আর্যগণের অন্যান্য শাখা ইরান, গ্রীসদেশ এবং ইওরোপের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে। আর্যগণের আসিবার আগে যে সকল আদিম অধিবাসী ভারতবর্ষে বাস করিত, তাহাদিগকে দ্রাবিড় বলা হয়। আর্যরা দ্রাবিড়দিগকে পরাজিত করে। প্রথমে আর্যরা পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। দ্রাবিড়রা পরাজিত হইয়া ক্রমেই দক্ষিণ ভারতের দিকে চলিয়া যায়। ক্রমে সেইখানেও আর্যরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এইভাবে দ্রাবিড়রা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

আর্যদের প্রাচীন সাহিত্য :

আর্যগণ ভারতে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তোলে। এই সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা বলা হয়। এই সভ্যতার পরিচয় আমরা আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ চারিটি বেদ হইতে পাইয়া থাকি। এই চারিটি বেদের নাম : ঋক্,

যজুঃ, সাম ও অথর্ব। সর্বপ্রথম রচিত হয় ঋগ্বেদ। ইহা কতকগুলি সূক্ত বা স্তোত্রের সমষ্টি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাণশক্তির নানাপ্রকার বর্ণনা এই সকল সূক্তে রহিয়াছে।

নীচে ঋগ্বেদের ঊষা-স্তোত্র হইতে দুইটি লাইন দেওয়া হইল :

প্রতি ধ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছান্তি পরি স্বসুঃ॥
দিবো অদর্শি দুহিতা—(৪।৫২।১)

বাংলা : মানুষের মনে যিনি প্রেরণা জাগাইয়া তোলেন, যিনি কল্যাণময়ী, যিনি অন্ধকার দূর করেন, সেই আকাশ-কন্যা ঊষাদেবী দেখা দিয়াছেন।

শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা :

আর্যগণ বিভিন্ন নেতার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। তাহারা ক্রমে নূতন নূতন স্থান জয় করিতে লাগিল। এইভাবে বহু রাজ্যের উৎপত্তি হইল। রাজা প্রায়ই অতি ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি অপর দলের আক্রমণ হইতে নিজের দলকে এবং দেশকে রক্ষা করিতেন। দেশের শাসনভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি ক্ষমতাশালী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজকার্যে 'সভা' এবং 'সমিতি' নামে দুইটি মন্ত্রণা পরিষদের মতামত লইতেন। রাজা রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন।



চিত্র ৩৫ : আর্যের চেহারা

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধকলহ সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। মহাভারতের যুদ্ধ ইহার একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপ যুদ্ধের ফলে একে একে ছোট ছোট রাজ্যগুলি বড় এবং শক্তিশালী রাজ্যের দখলে চলিয়া যাইত। যে সকল রাজা এইভাবে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তাঁহারা সম্রাট, একরাট্ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। এইরূপ উপাধি ধারণের আগে তাঁহারা রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞে রাজার মঙ্গলের জন্য রাজকর্মচারীরা দেবতার পূজা করিতেন এবং রাজপুরোহিত রাজার অভিষেক করিতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞে একটি ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই ঘোড়াটির সহিত রাজার সৈন্যরা থাকিত। ঘোড়া যে সকল অঞ্চল পরিক্রমা করিত সেই সকল অঞ্চল রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। কোন স্থানের রাজা বা দলপতি নিজেকে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী মনে করিলে এই ঘোড়াকে জোর করিয়া আটকাইতে পারিতেন। কিন্তু রাজার সৈন্যের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইত। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটি নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে ইহাকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হইত। নানারকম সংগীত ও আবৃত্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের অংগ ছিল।

বৈদিক যুগে অধিকাংশ রাজ্যেই একজন করিয়া রাজা রাজত্ব করিতেন। কিন্তু কতকগুলি রাজ্যে আবার জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভা শাসনকার্য চালইতেন। এইসকল রাজ্যে কোন রাজা থাকিতেন না। এইগুলিকে 'প্রজাতন্ত্র' বলা যাইতে পারে।

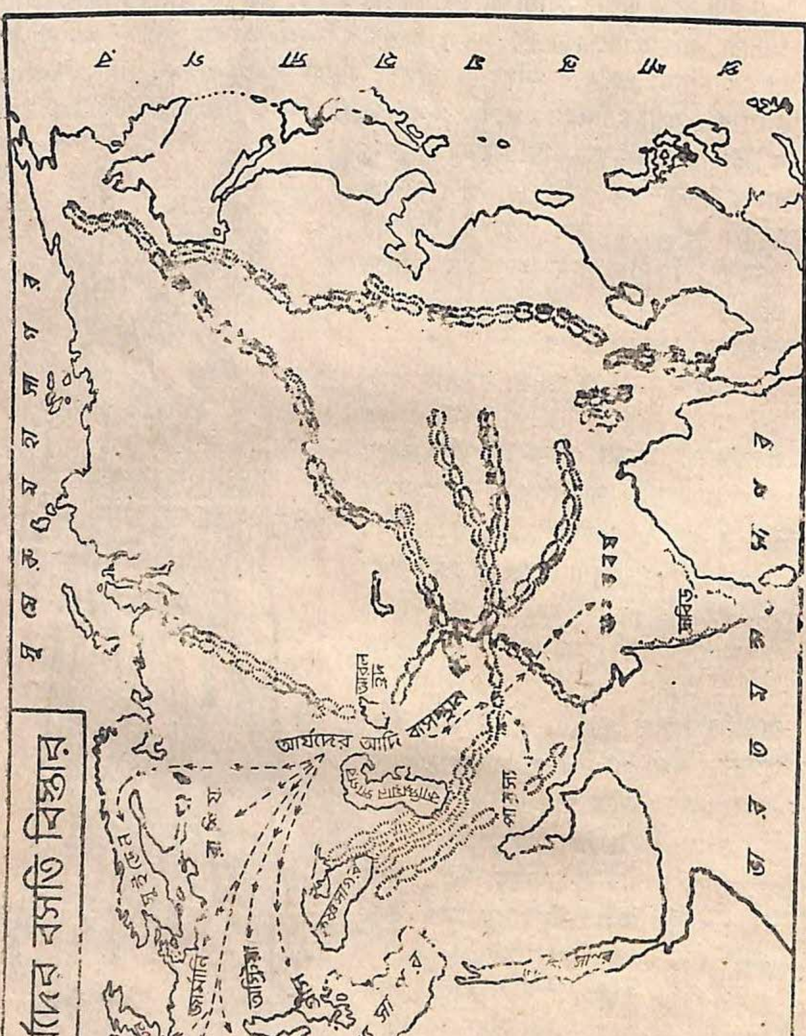
রাজকর্মচারিগণ রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে পুরোহিত ছিলেন সর্বপ্রধান। পুরোহিত রাজাকে মন্ত্রণা দান করিতেন এবং মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা রাজা এবং তাঁহার রাজত্বের মংগল সাধন করিতেন।

সেনানী ছিলেন রাজার সামরিক বাহিনীর প্রধান। তীরধনুক, বর্শা, অসি, কুঠার প্রভৃতি ছিল সৈনিকদের অস্ত্র। রথও তখন যুদ্ধে ব্যবহার করা হইত।



চিত্র ৩৬ : আর্য যোদ্ধা

সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি পরিবার পরিচালনা করিতেন। প্রত্যেক গৃহেই একটি করিয়া অগ্নিশালা থাকিত। স্ত্রী জাতিকে খুব সম্মান করা হইত। তাঁহারা পুরুষদের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। অপলা, ঘোষা, বিশ্বভারা প্রভৃতি নারীগণ ঐ সময়ে যথেষ্ট বিদ্যা



চিত্র ৩৭ : আর্যদের বসতি বিস্তার

অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্লোক, স্তোত্র ইত্যাদি রচনা করিতে পারিতেন।

বৈদিক যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ সূতী কাপড় দিয়া তৈয়ার করা হইত। পশম ও চামড়ার পোশাকও তখন ব্যবহার করা হইত। ঐ সময়কার প্রধান খাদ্য ছিল দুধ, শাকসব্জি, মাংস, মধু, মাখন, পিঠা, চিড়া ইত্যাদি। সোমরস ও সুরা নামক মাদক পানীয়ও তাহারা পান করিত। তাহারা নাচ-গান, শিকার, রথ-চালনা ইত্যাদি করিতে ভালবাসিত। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে জাতি-বিচারের কোন গোঁড়ামি ছিল না। সমাজ অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই চারি ভাগের মধ্যে কোন জাতিভেদ ছিল না। কাজের ভিত্তিতে এইরূপ চারিভাগ করা হইয়াছিল। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ক্রমে ক্রমে জাতি বিচারের গোঁড়ামি দেখা দিতে আরম্ভ করে।

আর্যগণ ছাত্র অবস্থায় গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষা শেষ হইলে তাহারা বিবাহাদি করিয়া গৃহী হইত। পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তাহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত অর্থাৎ সংসারের কাজ-কর্ম ত্যাগ করিয়া বনে ঘর বাঁধিয়া শান্তিতে সময় কাটাইত। বৃদ্ধ অবস্থায় তাহারা সন্ন্যাসী হইত। জীবনের এইরূপ ভাগকে চারি আশ্রম বা চতুরাশ্রম বলা হয়।

কৃষিই ছিল আর্যগণের প্রধান অবলম্বন। তাহারা গ্রামে বাস করিত। তাহারা পশুপালনও করিত। গরু ছিল তখনকার অতি মূল্যবান্ সম্পদ। কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার শিল্পও তখনকার লোক জানিত।

আর্যরা লিখিতে জানিত না বলিয়াই মনে করা হয়। কিন্তু ঐ সময়ে অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র তাহাদের জানা ছিল। ইহা ছাড়া ভাস্কর্য—অর্থাৎ পাথর খোদাই করিয়া মূর্তি তৈয়ার করা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা ইত্যাদিতে তাহারা পারদর্শী ছিল। পরবর্তী কালে আর্যরা উপনিষদ্ রচনা করিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়া ভগবানের পরম-শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা হইয়াছে।

আর্যগণের প্রধান দেব-দেবী ছিলেন ধাত্রী, বিধাত্রী, প্রজাপতি, শ্রদ্ধা, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজাও তাহারা করিত। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্র, ঊষা, রুদ্র, পৃথিবী ইত্যাদি ছিলেন তাহাদের প্রাকৃতিক দেবতা।

(২) প্রাচীন পারস্য বা ইরান :

আর্যগণের এক শাখা পারস্য বা ইরানে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রাচীন ইরানী ভাষা আর্যভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে 'মিডি' নামক পারসিক জাতির এক শাখা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা আসিরীয় দেশগুলির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। তারপর কিছুদিনের জন্য পারস্য ও মিডি ইত্যাদি দেশের মধ্যে এক আত্মকলহ দেখা দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট সাইরাস্ পারস্য এবং মিডির সিংহাসন দখল করিলে পর এই আত্মকলহ শেষ হয়। ঐ সময় হইতে পারস্য সাম্রাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে।

ইরানীগণ প্রথম প্রথম প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। বৈদিগ যুগে ভারতবাসীরাও ঐরূপ করিত। কিন্তু ইরানীগণের মধ্যে জরথুস্ত্র নামে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জরথুস্ত্র কখন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক জানি না। অনেকে তাঁহাকে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক মনে করেন। তাঁহার ধর্মনীতি এবং স্তোত্র তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে একত্রিত করিয়া 'জেন্দ্ আভেস্তা' নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবন্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে তাঁহার ধর্মনীতি এবং উপদেশ সম্পর্কে আমরা জানিতে পারি। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীতে সৎ এবং অসৎ, এই দুই শক্তির মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তাঁহার মতে অহুর-মাজ্দা ছিলেন আলো, সত্য, স্বর্গ ইত্যাদির দেবতা। অহুর-মাজ্দার সহায়ক একদল দেবতা ছিলেন। অসৎ শক্তির দেবতা ছিলেন আহ্রিমান। ইনি অন্ধকার, কপটতা ইত্যাদি দুষ্ট শক্তির দেবতা। জরথুস্ত্র ইরানীদের মধ্যে অহুর-মাজ্দার উপাসনা প্রবর্তন করেন।

ইরানীদের কোন দেবতার মূর্তি নাই। তাহাদের মধ্যে পুরোহিত আছে বটে, কিন্তু তাহারা মন্দিরের মধ্যস্থলে বেদী নির্মাণ করিয়া তাহাতে আগুন জ্বালিয়া তাহার সম্মুখে উপাসনা করে। এই আগুন তাহাদের নিকট অতি পবিত্র। তাহাদের বিভিন্ন মন্দিরে যে আগুন জ্বালিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা অতি প্রাচীনকাল হইতে অনির্বাপিত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে। কোন নূতন মন্দির স্থাপিত হইলে পুরাতন কোন মন্দির হইতে আগুন লইয়া আসিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইতে হয়। এইভাবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া একই আগুন জ্বলিতেছে।

ইরানীরা মৃতের শবদেহ উঁচু খোলা ছাদে ফেলিয়া রাখে। এই কাজের জন্য উঁচু খোলা ছাদকে "টাওয়ার অব্ সায়লেন্স" বলা হয়। শকুন, চিল, বাজ

পাখী ইত্যাদি মৃতদেহের মাংস খাইয়া যায়। মৃত দেহ পোড়াইয়া ফেলিলে বা কবর দিলে কোন কাজে লাগে না। কিন্তু পাখীকে খাইতে দিলে মৃতদেহের সদ্ব্যবহার হইল—এইরূপ মনে করিয়াই বোধ করি এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে অনেক পার্সী আছেন। ইঁহারা ইরানীদের বংশধর। তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন ইরানী ধর্মনীতি, আচার-ব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে।

(৩) হোমার বর্ণিত গ্রীসদেশ :

গ্রীক্‌গণ আর্য জাতির এক শাখা। ইহারা গ্রীসদেশের আদি বাসিন্দা নহে। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাহারা গ্রীসদেশে আসে। ইহার আগে তাহারা বল্‌কান দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বাস করিত।

অন্যান্য আর্য জাতির লোকদের মতো গ্রীক্‌রাও অতি প্রাচীনকাল হইতে গান, কবিতা ইত্যাদি রচনা করিতে শিখিয়াছিল। তাহাদের সভ্যতার প্রথম দিকেই দুইটি মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। এই দুই মহাকাব্যের নাম ইলিয়াড এবং ওডিসি। হোমার নামে এক অন্ধ কবি এই দুই মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বলা হয়।

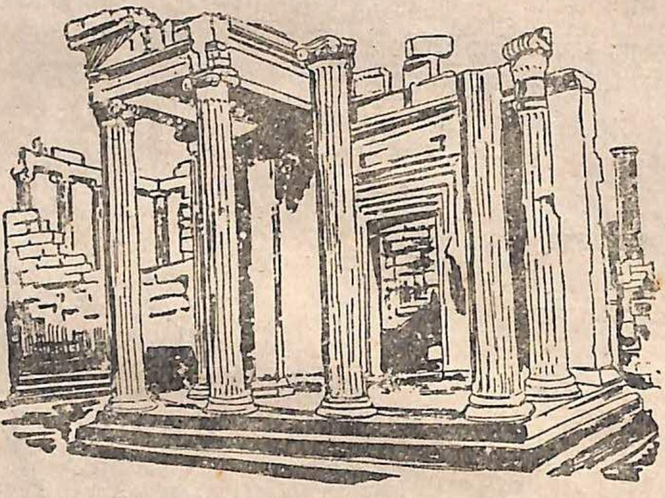


চিত্র ৩৮ : প্রাচীন গ্রীসের একটি পাত্র

স্পার্টার রাজা মেনিলসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইজন্য গ্রীক দেশগুলির রাজারা ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওনা হন। আগামেম্‌নন, ইনিয়াস, ওডেসিয়াস্ বা ইউলিসিস্ একিলিস্ ইত্যাদি গ্রীক্ বীরগণ ট্রয় যুদ্ধে যোগদান করেন। গ্রীক্ দেবতারাও এই যুদ্ধে গ্রীক্‌গণকে সাহায্য করেন। আমাদের মহাভারতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ট্রয়ের যুদ্ধের পর ওডেসিয়াস্ বহু বৎসর সমুদ্রপথে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ট্রয়ের যুদ্ধের ঘটনার উপর

'ইলিয়াড', এবং ওডেসিয়াসের ভ্রমণের উপর 'ওডিসি', এই দুই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য হইতে যেমন আমরা প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানিতে পারি, সেইরূপ ইলিয়াড এবং ওডিসি হইতে প্রাচীন গ্রীসের অবস্থা সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। গ্রীক্ মহাকাব্য হইতে আমরা জানি যে, তখনকার গ্রীক্‌গণ লোহার ব্যবহার জানিত না। তাহারা গ্রামে বাস করিত। তাহাদের ঘর-বাড়ি ছিল অতি সাধারণ কুটীরের মতো। ক্রমে তাহারা শহর স্থাপনের এবং উন্নত জীবনের ধারণা পায় এবং আথেন্স, করিন্থ, থীব্‌স, স্পার্টা, মাইলেটাস, সেমোস্ প্রভৃতি গ্রীক্ শহর গড়িয়া তোলে।



চিত্র ৩৯ : একটি গ্রীক্ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

গ্রীসদেশের প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজা ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা খুব বেশি ছিল। তিনি ছিলেন প্রধান পুরোহিত, প্রধান বিচারক এবং প্রধান সেনা-নায়ক। আইনত তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু কার্যত তিনি বয়োবৃদ্ধগণের সভা এবং জনসাধারণের সভা—এই দুই পরিষদের মতামত লইয়া শাসনকার্য চালাইতেন। পরবর্তী কালে গ্রীসের অনেক দেশেই রাজতন্ত্র লোপ পাইয়াছিল এবং অভিজাতগণ শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছিল।

হোমারের যুগে গ্রীক্ সমাজ চারিভাগে বিভক্ত ছিল—যথা, অভিজাত সম্প্রদায়, স্বাধীন ব্যক্তি, স্বাধীন শ্রমিক এবং ক্রীতদাস। সমাজ-জীবন ছিল অতি সহজ এবং সরল। নিজের কাজ নিজে করিতে কেহ অপমান বোধ করিত না। রাজ-পরিবার বা অভিজাত শ্রেণীর পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা সাধারণ লোকের মতো নিজের কাজ করিতেন।

কৃষিকার্য এবং পশুপালন ছিল তখনকার প্রধান উপজীবিকা। গ্রীক্‌গণ তখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ততটা মনোযোগ দেয় নাই। ফিনিসীয় জাতির লোকেরা তখন গ্রীস দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল।

তখন প্রকৃতির উপাসনা করা হইত। দেবতার নিকট বলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীক্‌দের বিশ্বাস ছিল যে, আলিম্পাস নামক পর্বতে তাহাদের দেবতারা বাস করেন। জিউস্ ছিলেন গ্রীক্ দেব-দেবীর মধ্যে সর্বপ্রধান। অন্যান্য দেবতারা, যেমন অ্যাপোলো, আথেনা ইত্যাদি ছিলেন জিউসের সন্তান।

গ্রীক্‌গণ বিশ্বাস করিত যে, তাহারা হেলেন নামক এক আদি জননীর সন্তান। সেইজন্য তাহারা নিজদিগকে হেলেনীজ্—অর্থাৎ হেলেনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিত, তাহাদের দেশকে বলিত হেলাস্।

আলোচনা

১। আর্যজাতি বলিতে কাহাদের বুঝায়? বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যগণের ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজ কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা কর। [M.E. 1968]

২। বৈদিক যুগের আর্যদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান? অথবা বৈদিক যুগের আর্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্য, ধর্মাচরণ ও জীবিকা কিরূপ ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1970]

৩। ভারতের আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা বর্ণনা কর।

৪। প্রাচীন পারস্য দেশের সভ্যতার বর্ণনা দাও।

৫। হোমার-বর্ণিত গ্রীক্ সভ্যতা সম্পর্কে যাহা জান লিখ। গ্রীক দেবদেবীর কথা কি জান? [M.E. 1970]

৬। হোমারীয় যুগের গ্রীকদের জীবনযাত্রাপ্রণালী কিরূপ ছিল? [M.E. 1968]

৭। স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ইহার তুলনায় কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ মনে কর? [M.E. 1970]

৮। এক কথায় উত্তর লিখ :—

(১) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদের নাম কি? (২) প্রাকৃতিক শক্তি পূজা কাহারা করিত? (৩) ইরানীদের ধর্মপুস্তকের নাম কি? (৪) আহুর-মাজ্‌দা কে ছিলেন? (৫) 'টাওয়ার অব সায়লেন্স' কাহাকে বলে?

(৬) ইরানীগণ কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন? (৭) হোমারের কাব্যদ্বয়ের নাম কি? (৮) ইরানীদের মধ্যে কে এবং কোন্ দেবতার উপাসনা প্রবর্তন করেন?

৯। গ্রীক্‌জাতি ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল কেন?

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(১) নানারকম—ও—অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ ছিল।

(২) খৃীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট—পারস্য এবং—সিংহাসন দখল করেন।

(৩) ইরানীদের মধ্যে—নামে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) গ্রীক্‌গণ নিজেদেরকে—বলিয়া পরিচয় দিত এবং তাঁহাদের দেশকে —বলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিনিসীয় বণিক : ইহুদী দ্রষ্টা বা ঋষিগণ

ফিনিসীয় বণিক :

আর্য সভ্যতার বহু পূর্ব হইতেই সমুদ্রপথে চলাচল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য লোকে জানিত। মিশর এবং ক্রীটের নাম এই বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু নৌচালনা এবং সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিনিসীয়রা ছিল সবচেয়ে পটু। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিসিয়া নামক স্থানে ইহারা বাস করিত। তাহারা দেবদারু জাতীয় একরকম গাছের কাঠ দিয়া অতি সুন্দর সুন্দর নৌকা তৈয়ার করিত। নৌকাগুলির গড়ন দেখিতে কতকটা ময়ূরের মতো ছিল। নৌকার মাঝখানে একটা বিরাট বাক্সের মতো থাকিত। তাহাতে ছোট ছোট কোঠা ছিল। এইগুলির মধ্যে তাহারা মালপত্র রাখিত এবং নিজেরা থাকিত। নৌকাগুলি বড় বড় পাল এবং দাঁড়ের সাহায্যে চলিত। ক্রীতদাসদের দিয়া নৌকার দাঁড় টানান হইত। ফিনিসীয়রা সমুদ্রপথে চলিতে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল। তখনও নাবিকের কম্পাস আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহারা আকাশের তারা দেখিয়া রাত্রে তাহাদের পথ ঠিক করিয়া লইত, এবং সেই পথ ধরিয়া দিনের বেলায়ও চলিত। মিশরের ফারাও নেকো একবার কয়েকজন ফিনিসীয়কে জলপথে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহারা সুয়েজ উপসাগর হইতে রওনা হইয়া ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া নীল নদের মোহনায় পৌঁছিয়াছিল।

ফিনিসীয়দের প্রধান শহর দুইটির নাম ছিল টায়ার ও সীডন্। ক্রমে ক্রমে তাহারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নানাস্থানে বসতি বিস্তার করিতে থাকে। আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজ নামক স্থানে তাহাদের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফিনিসীয়রা সাইপ্রাস, ক্রীট্, মিশর,



চিত্র ৪০ : ফিনিসীয় নৌকা

সিসিলি, ইতালি, স্পেন এবং ইংলণ্ডের সহিত সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। তাহারা স্পেন হইতে রূপা, আফ্রিকা হইতে হাতির দাঁত এবং ইংলণ্ড হইতে টিন কিনিত। তাহারা নিজ দেশ হইতে নানারকম উলের পোশাক, মদ, ফল ইত্যাদি অপর দেশে লইয়া যাইত। এইগুলির বদলে অপর দেশ হইতে অন্যান্য জিনিস লইয়া আবার অন্য দেশে যাইত। এইভাবে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। তাহারা খাদ্য-শস্য, হাতির দাঁত, কাচের পাত্র, সোনা, রূপা, তামা, মণিমুক্তা, চীনামাটির বাসন ইত্যাদির ব্যবসা করিত। তাহারা একরকম মাছ এবং গাছের শিকড় হইতে লাল রং তৈয়ার করিত। নানাদেশে এই রংয়ের খুব চাহিদা ছিল। তাহারা ক্রীতদাসের ব্যবসাও করিত।

ফিনিসীয়দের গায়ের রং ছিল লাল। 'ফিনিসীয়' কথাটির মূল অর্থ হইল "লাল চামড়ার মানুষ"। সমুদ্রপথে চলাচল করিতে করিতে সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস এবং সূর্যের তাপে তাহাদের রং পুড়িয়া লাল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে 'ফিনিসীয়' নাম দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা দাড়ি রাখিত। মাথায়

একরকমের উঁচু টুপি পরিত এবং গায়ে লম্বা ঝোলা জামা পরিত। সেগুলির উপরে তাহারা চাদরের মতো একখানা কাপড় জড়াইয়া রাখিত।

ফিনিসীয়রা ছিল অত্যন্ত দক্ষ কাজের লোক। তাহারা নানা ধরনের মালপত্র কেবল তৈয়ারই করিতে পারিত এমন নহে, তাহারা ব্যবসায়ী হিসাবেও খুব চালাক ছিল। আজ হইতে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে আমাদের দেশে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করিত। পর্তুগীজরা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী এবং অন্যায়পরায়ণ। ফিনিসীয় বণিকগণও পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের মতোই সততা বা ন্যায়ের ধার ধারিত না। পর্তুগীজদের মতোই তাহারা ছিল অর্থলোভী এবং শঠ। টাকা-পয়সা লাভ করাই ছিল তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহারা অনেক সময় জলদস্যুতা, লুটতরাজ করিয়া ব্যবসার জিনিসপত্র সংগ্রহ করিত। তাহারা অপর দেশের লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিয়া দিত। তথাপি ইওরোপের দেশগুলি ফিনিসীয়দিগের নিকট নানাভাবে ঋণী।

ফিনিসীয়রা লিখিতে জানিত। তাহারা সুমেরীয়দের নিকট হইতে লিখিতে শিখিয়াছিল। মিশরীয়দের মতো তাহারাও প্যাপিরাসের মতো এক-প্রকার কাগজের উপর লিখিত। নানাদেশে তাহারা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে যাইত, তখন জিনিসপত্রের তালিকা করা, দাম ইত্যাদি লিখিয়া রাখার প্রয়োজন হইত। অনেক সময় এই সকল লেখা কাগজ তাহারা অপর দেশের ব্যবসায়ীদিগের নিকটও দিয়া আসিত। এই সব কাগজে কি কি জিনিস কেনা হইল এবং তাহার বদলে কি কি জিনিস দেওয়া হইল, এই সব কথা লেখা থাকিত। এই লেখা প্রথমে গ্রীক্‌গণ শিক্ষা করে। তাহারা এই লেখার অক্ষরগুলির কিছু পরিবর্তন করিয়া লয়। গ্রীক্‌গণ হইতে ক্রমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে অক্ষরের জ্ঞান জন্মে। ইহা ছাড়া, হিসাবের জন্য গণিতশাস্ত্রও ফিনিসীয়গণ শিখিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণিত এবং বীজগণিতের জ্ঞান বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ফিনিসীয়গণ মিশর, সুমের ইত্যাদি স্থানের সহিত ব্যবসা করিত। সুতরাং এই সকল স্থানের উন্নত সভ্যতা তাহাদের মারফত ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইহুদী দ্রষ্টা বা ঋষিগণ :

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগের কথা। ইউফ্রেটিস্‌ নদীর মোহনার পাশে উর্‌ নামে একটি অঞ্চল ছিল। সেখানে হিব্রু বা ইহুদীরা বাস করিত। খ্রীঃ পূঃ দুই হাজার বছর আগে তাহারা তাহাদের নিজের দেশ

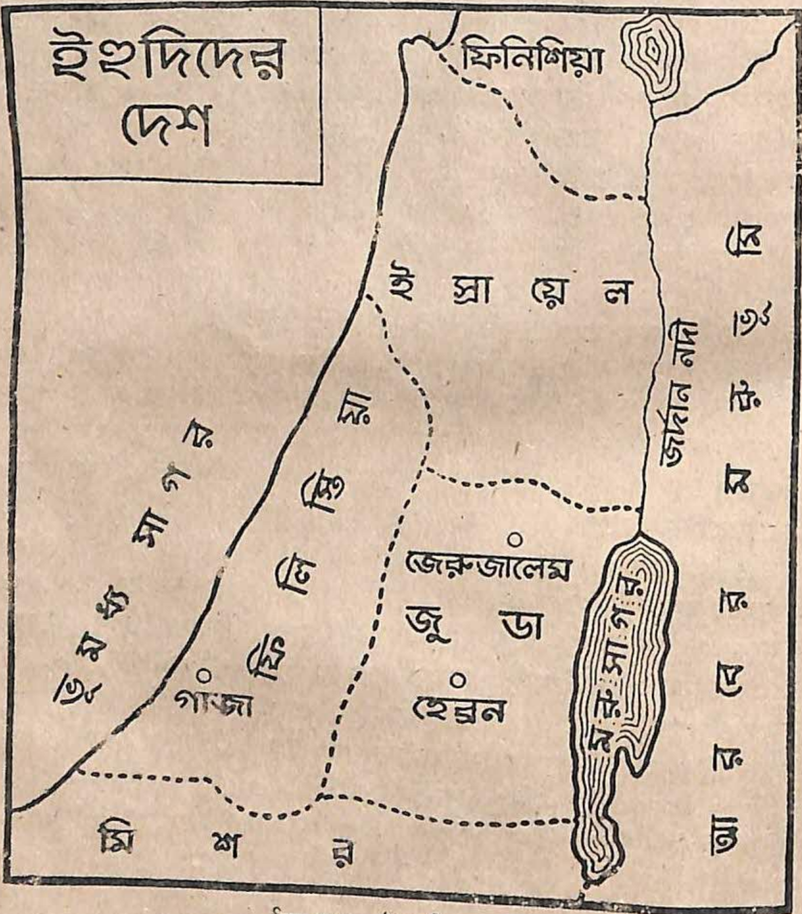
ত্যাগ করিয়া মিশরে চলিয়া যায়। ইহুদীদের প্রধান পেশা ছিল মেষপালন। তাহারা মিশরে কয়েক শতাব্দী বাস করিবার পর হিক্‌সস্‌রা মিশর দখল করে। ইহুদীরা হিক্‌সস্‌দিগকে সাহায্য করে। এইজন্য তাহারা হিক্‌সস্‌দের অধীনে বেশ ভালভাবেই বসবাস করিতে পায়। পরে যখন মিশরীয়রা হিক্‌সস্‌দিগকে তাড়াইয়া দিল তখন ইহুদীদের দুর্দিন আসিল। হিক্‌সস্‌দিগকে সাহায্য করার অভিযোগে ইহুদীদিগকে মিশরীয়রা ক্রীতদাসে পরিণত করিল। তাহাদিগকে রাস্তা তৈয়ার, পিরামিড তৈয়ার ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজে জোর করিয়া খাটান হইল। তাহারা যাহাতে দেশ হইতে পলাইয়া না যায়, সেজন্য সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হইল।

ইহুদীরা যখন এইরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছিল, তখন তাহাদের নেতা মোজেজ্‌ বা মুশা তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইহুদীরা ভগবান্‌কে জিহোবা বলিত। মোজেজ্‌ নাকি ছিলেন জিহোবার দূত।

ইহুদীগণকে লইয়া মোজেজ্‌ যখন লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় মিশরের ফারাও তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সহ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য লোহিত সাগর পার হইবার চেষ্টা করেন। মোজেজ্‌ তাঁহার মন্ত্রপূত দণ্ড দেখাইতেই লোহিত সাগরের জল দুই পাশে সরিয়া গেল এবং মধ্যস্থলের রাস্তা দিয়া তিনি ইহুদীগণকে লইয়া অপর তীরে চলিয়া গেলেন। ফারাও তাঁহার রথ, সৈন্য ইত্যাদি সহ ঐ রাস্তা ধরিয়া লোহিত সাগর পার হইতে গেলেন। ঐ সময়ে মোজেজ্‌ আবার তাঁহার দণ্ডের সাহায্যে সাগরের জলকে পূর্বের স্থানে ফিরাইয়া আনিলেন। ফলে, সমুদ্রের প্রবল বন্যায় ফারাও-র সৈন্য, রথ ইত্যাদি লোহিত সাগরের জলে ভাসিয়া গেল। ফারাও নিজেও জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইলেন। মোজেজ্‌ ইহুদীগণকে লইয়া পেলেস্টাইন—বা 'প্রতিশ্রুত স্থানে' আসিয়া পেঁৗছিলেন। হিব্রু বা ইহুদীগণের ধর্মগুরু আব্রাহাম ভগবানের নিকট হইতে একটি পবিত্র স্থানে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন—এইরূপ একটি উপকথা আছে। পেলেস্টাইন্‌ সেই প্রতিশ্রুত স্থান।

মোজেজ্‌ ইহুদীদিগকে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা দেন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এই ধারণা সর্বপ্রথমে মোজেজের মনেই উদয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, একদিন মোজেজ্‌ জিহোবার আদেশে এক অতি উঁচু পাহাড়ে চলিয়া যান। তারপর দারুণ ঝড় আরম্ভ হয়। ঝড় থামিলে পর মোজেজ্‌ ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে দুইখানি পাথর ছিল। তাহাতে জিহোবার বাণী খোদাই হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া গেল। ইহুদীগণকে সৎপথে চালিত

করিবার উদ্দেশ্যে জিহোবা দশটি নির্দেশ এই পাথরে খোদাই করিয়া দিয়াছেন। এই নির্দেশগুলি এইরূপ : (১) পিতামাতাকে সম্মান করিও, (২) কাহাকেও



চিত্র ৪১ : ইহুদীদের দেশ

হত্যা করিও না, (৩) চরিত্রভ্রষ্ট হইও না, (৪) কখনও চুরি করিও না, (৫) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও না, (৬) প্রতিবেশীর সম্পত্তি বা কোন কিছুর প্রতি লোভ করিও না, (৭) মূর্তি পূজা করিও না, (৮) ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, (৯) বৃথা—অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য—ভগবানের নাম

উচ্চারণ করিও না, (১০) পবিত্র কাজের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট রাখিও।

পেলেস্টাইনে পোঁছিয়া ইহুদীরা এক রাজ্য স্থাপন করে। তাহাদের রাজধানী হইল জেরুজালেম। কিন্তু তাহাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচিল না। ফিলিস্টাইন নামক এক জাতীয় লোকের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল।

ইহুদীগণের রাজাদের মধ্যে **সল, ডেভিড্ এবং সলোমনের** নাম উল্লেখযোগ্য। সল ফিলিস্টাইনদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হন। ডেভিড্ ফিলিস্টাইনদিগকে পরাজিত করেন। সলোমন ছিলেন ইহুদী রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেচক রাজা ছিলেন। তাঁহার বিচার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। সলোমন নানাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ইহুদীদের ধর্মমত ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে (Old Testament) বর্ণিত আছে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্বে ইহুদী দ্রষ্টা বা ঋষিগণ যীশুর অগ্রদূত হিসাবে প্রচারকার্য চালাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের নীতিবাক্য ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে লিপিবদ্ধ আছে। যীশুখৃষ্টের বাণী নিউ টেস্টামেণ্টে (New Testament) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই অংশকে একত্রে বাইবেল (The Bible) বলা হয়।

ইহুদীগণ নিজদিগকে অন্যান্য জাতির বা ধর্মের লোক অপেক্ষা উচ্চ মনে করিত। তাহারা মনে করিত যে, তাহারাই ভগবানের প্রিয় জাতি। সেইজন্য অপরাপর লোক হইতে তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নেবুকাড্নেজার জেরুজালেম নগর ধ্বংস করেন এবং উহার ধনরত্ন ব্যাবিলনে লইয়া যান। অনেক ইহুদী এই সময় প্রাণ হারায়। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের অনেককেই ব্যাবিলনে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেইখানে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। ব্যাবিলনের পর আবার পারস্য সাম্রাজ্য জেরুজালেমের উপর আধিপত্য করে। এইরূপে স্বাধীনতা হারাইয়া ইহুদীরা নানাদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

আলোচনা

১। ফিনিসীয়রা কোন্ দেশের লোক? তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [M.E. 1957]

২। নৌবিদ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ফিনিসীয়দের দান কি তাহা আলোচনা কর।

৩। ইওরোপে অক্ষর এবং গণিতশাস্ত্রের জ্ঞান কিভাবে আসিয়াছিল?

৪। ইহুদীদিগের ইতিহাসে মোজেজ্ ও সলোমনের নাম বিখ্যাত কেন? [M.E. 1959]

৫। ইহুদী ধর্মগুরু সম্বন্ধে কি জান? ইহুদীদের ধর্মমত কোন্ পুস্তকে লেখা আছে?

৬। "দশটি নৈতিক নির্দেশ" কাহাকে বলে এবং কি কি?

৭। মোজেজ্ কে? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান? সলোমনের রাজত্বের বিবরণ দাও। [M.E. 1956]

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(১) ফিনিসীয়দের প্রধান শহর দুইটির নাম ছিল—ও—। (২)—ছিলেন ইহুদীজাতি ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি। (৩) —সময় হইতে ইহুদী রাজ্যের উন্নতির সোপান স্থাপিত হইয়াছিল। (৪) ইহুদীদের প্রধান পেশা ছিল—।

৯। এক কথায় উত্তর দাও:

(১) 'ফিনিসীয়' কথাটির মূল অর্থ কি? (২) ফিনিসীয়রা কাহাদের নিকট হইতে লিখিতে শিখিয়াছিল? (৩) ইহুদীরা কোথায় বাস করিত? (৪) কে জেরুজালেম নগর ধ্বংস করেন?

১০। কিভাবে ফিনিসীয়গণ সমুদ্রে দিক নির্ণয় করিত?

১১। মোজেজ্ কিভাবে ইহুদীদের মিশর হইতে উদ্ধার করেন?

১২। টীকা লিখ: ফিনিসীয়দের বাণিজ্য। [M.E. 1960]

১৩। ফিনিসীয়গণ উদ্যমশীল বণিক ছিলেন। নানা কারণে ইওরোপ তাঁহাদের নিকট ঋণী। এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ কর। [M.E. 1967]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীক্ নগর রাষ্ট্র: স্পার্টা ও আথেন্স

গ্রীস পর্বতসংকুল দেশ। এই পর্বতগুলি গ্রীসদেশের অভ্যন্তরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়াছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতল অংশে প্রাচীনকালে এক একটি করিয়া স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে এই সকল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া একদেশ হইতে অপর দেশে যাতায়াত খুব কঠিন ছিল। তাই সমগ্র গ্রীসদেশটা একই রাজার অধীনে, একই দেশ হিসাবে গড়িয়া ওঠে নাই। প্রত্যেকটি ছোট ছোট খণ্ড এক একটি ছোট স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সকল বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা একই গ্রীক্ জাতির লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে একই রূপ রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তবু প্রত্যেক

রাজ্যেরই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। স্পার্টা, আথেন্স, থীব্স, করিন্থ্ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। এখানে আমরা গ্রীসের প্রধান নগর দুইটির জীবনযাপন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

স্পার্টা :

প্রাচীনকালে স্পার্টার লোকদের জীবনযাপন-প্রণালী আলোচনা করিলে আমরা অতি অদ্ভুত কতকগুলি প্রথার কথা জানিতে পারি। স্পার্টার জাতীয় উপাখ্যান হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের দেশে লাইকারগাস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্পার্টানদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্পার্টায় একসঙ্গে দুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তখন যুদ্ধ-বিবাদ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। সেইজন্য দুইজন রাজা থাকিলে সুবিধা হইত। যুদ্ধ লাগিলে একজন যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন, অপর জন রাজ্যের শাসনকার্য চালাইতেন। রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করিত দুইটি পরিষদ। এই দুই পরিষদের একটি ছিল বয়োবৃদ্ধদের, অপরটি ছিল জনসাধারণের।

স্পার্টানগণ তাহাদের নিজ শক্তির তুলনায় অধিক স্থান অধিকার করিয়াছিল। যাহাদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্য বিস্তার করা হইয়াছিল, সেই সকল লোক স্পার্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চাহিত। এই সব কারণে স্পার্টানদিগকে সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত এবং ভালভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। সন্তান জন্মিলে পর সেই সন্তান দুর্বল বা বিকলাঙ্গ হইলে তাহাকে পাহাড়ের জঙ্গলে রাখিয়া আসা হইত। বন্য পশুপক্ষী তাহাকে খাইয়া ফেলিত। ইহাতে স্পার্টান মায়েরা কাঁদিতেন না। স্পার্টান স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্পার্টান জাতিকে বীরের জাতিতে পরিণত করা। দুর্বল বা বিকলাঙ্গের সেখানে স্থান ছিল না। তারপর সাত বছর বয়সে সকল বালককেই সামরিক শিক্ষার জন্য সরকারী সেনানিবাসে থাকিতে হইত। সেইখানে তাহারা বেশির ভাগ সময়ই সামরিক কুচকাওয়াজ করিত। তাহাদিগকে পুরোপুরি খাবার দেওয়া হইত না। তবে চুরি করিয়া প্রত্যেকেই নিজের জন্য আরও খাবার যোগাড় করিতে পারিত। চুরি করিয়া খাওয়া দোষের ছিল না, কারণ, চুরি করিতে গেলে বুদ্ধি ও দুঃসাহসের দরকার হয়। স্পার্টান সৈন্যগণের মধ্যে এই সকল গুণ বাড়াইবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। কারণ ধরা পড়াটাই অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

এইভাবে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে সেনানিবাসে বাস করিতে হইত। মেয়েরাও কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত নানাপ্রকার ব্যায়াম ইত্যাদি করিতে বাধ্য ছিল।

স্থলযুদ্ধে সমগ্র গ্রীসদেশে স্পার্টানদের মতো পারদর্শী যোদ্ধা আর কেহ ছিল না। তাহারা ক্রমে ক্রমে গ্রীসের দক্ষিণ অংশের প্রায় সকল দেশ জয় করিয়াছিল। কিন্তু শরীরকে শক্ত করিয়া ভাল যোদ্ধা হইতে গিয়া স্পার্টানদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা স্বভাবতই কমিয়া গেল। গ্রীসদেশে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্পার্টানদের মধ্যে জন্মান নাই।

স্পার্টানদের সামাজিক জীবন ছিল খুব সহজ ও সরল। আজ পর্যন্ত স্পার্টানদের সরলতা প্রবাদ বাক্য হিসাবে প্রচলিত আছে। সমাজ চারিভাগে বিভক্ত ছিল। সমাজে সর্ব নিম্নস্তরে ছিল ক্রীতদাসরা। ক্রীতদাসদের প্রতি সাধারণত সদয় ব্যবহারই করা হইত।

আথেন্স :

স্পার্টার পরেই আথেন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমে আথেন্স স্পার্টার মতো এত ক্ষমতাশালী ছিল না বটে, কিন্তু পরে উহা স্পার্টা হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে আথেন্স গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তাই দেশে কোন রাজা ছিলেন না। সলোন নামক এক নেতা গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন করেন। সলোনের পূর্বে অবশ্য আথেন্সের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তখন লোকেরা ছিল অত্যন্ত গরীব। কয়েকজন লোকের হাতে ছিল সরকারী ক্ষমতা। ইহাদিগকে 'আর্কন' বলা হইত। গরীবরা ধনী ব্যক্তিদের কাছ হইতে টাকা ধার লইত। সময়মতো তাহা শোধ না করিতে পারিলে মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হইতে হইত। আইন-কানুন ছিল অত্যন্ত কঠোর। সামান্য একটা বাঁধাকপি চুরি করিলে তাহার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। এইরূপ দুরবস্থায় থাকিয়া যখন আথেন্সবাসী বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হইল, তখন সলোনকে এই সকল ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করিতে অনুরোধ করা হয়।

সলোন ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি দেখিলেন যে, একসঙ্গে যদি পুরাতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া দেন, তবে হয়তো অনেকেই অসন্তুষ্ট হইবে। সেইজন্য তিনি একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি পুরাতন ব্যবস্থা অনুযায়ী আর্কনের পদগুলি রাখিলেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধদের সভা এবং জনগণের পরিষদের হাতে ক্ষমতা দিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তিনি জনসাধারণের সভার উপর বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিলেন। এইভাবে তিনি শাসন-ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতা স্বীকার করিলেন।

তিনি সকলের ঋণ বাতিল করিয়া দিলেন। কাহাকেও আর ঋণের টাকা দিতে হইল না। ঋণ পরিশোধ না করিতে পারিলে ক্রীতদাস হওয়ার প্রথা উঠাইয়া দিলেন। রাজ্যের সকলকে লেখাপড়া, স্বাস্থ্যচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আথেন্সবাসিগণের নাগরিক কর্তব্যজ্ঞান ও চেতনা বাড়াইবার জন্যও তিনি উৎসাহ দান করিলেন। এই সব কারণে আথেন্সবাসীরা স্পার্টানদের তুলনায় শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়া অনেক উন্নত হইতে পারিয়াছিল। গ্রীক্ মনীষীদের অনেকেই আথেন্সবাসী। গ্রীক্ সভ্যতার চরম বিকাশ আমরা দেখিতে পাই আথেন্সের ইতিহাসেই।



চিত্র ৪২ : পেরিক্লিস



চিত্র ৪৩ : সক্রেটিস

পেরিক্লিস্ নামে এক জন-নায়কের অধীনে আথেন্স রাজনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয় দিক দিয়াই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। আথেন্সের সাম্রাজ্য স্থল এবং জলপথে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। জলপথে চলাচলের প্রয়োজনের চাপে আথেন্স নৌবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। স্পার্টা যেমন স্থলযুদ্ধে ছিল অপরাজেয়, আথেন্স ছিল তেমনি জলযুদ্ধে অপরাজেয়। ইহা ভিন্ন মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে আথেন্সের দান

অতুলনীয়। চিন্তাশীল গ্রীক্ দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ভাস্কর, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি প্রায় সকলেই আথেন্সে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টট্‌ল তাঁহাদের দানে জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ ছিলেন প্লেটোর গুরু। সক্রেটিস্ অবশ্য কোন লিখিত পুস্তক রাখিয়া যান নাই। তিনি মুখে মুখে প্রশ্নোত্তর দ্বারা জ্ঞান দান করিতেন। তাঁহার শিষ্য প্লেটোর লেখা আজও আমাদিগকে জ্ঞান দান করিতেছে। এরিস্টট্‌লের চিন্তাধারা এখনও আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করে। বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার এরিস্টট্‌লের নিকট বাল্যকালে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এস্কাইলাস্, ইউরিপিডিস্, সফোক্লিস্ ও এরিস্টফেনিস্ ছিলেন পেরিক্লিসের যুগের নাট্যকার।

ফিডিয়াস নামক একজন ভাস্কর আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আথেনার একটি



চিত্র ৪৪ : আথেনা



চিত্র ৪৫ : হেরোডোটাস

ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইক্‌টিনাস নামক স্থপতি পার্থেনন নামক মন্দির তৈয়ার করেন। আথেনার মূর্তিটি এই মন্দিরে এমনভাবে রাখা হইয়াছিল যে, সমুদ্রপথে বহু দূর হইতে এই মূর্তি দেখা যাইত। প্রাক্‌সিটিলিস্ ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। তাঁহার নির্মিত হার্মে ও আফ্রদিতির মূর্তি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আফ্রদিতির মূর্তি দেখিবার জন্য নানাদেশ

হইতে লোক আসিত। হেরোডোটাস্ এবং থ্যুকিডিডিস্ ছিলেন ঐ সময়ের দুইজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। হেরোডোটাস্‌কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। ইনিই ইতিহাস লেখার পথ প্রদর্শন করেন। স্পার্টা এবং আথেন্সের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ বাধিয়াছিল। থ্যুকিডিডিস্ তাহার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। থ্যুকিডিডিস্ এই যুদ্ধে নিজের দেশ রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত বাগ্মী ডেমস্থিনিস, প্রসিদ্ধ সামরিক নেতা এল্‌কিবিয়াডিস্ আথেন্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচনা

১। স্পার্টান্‌দিগের জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর। তাহারা সকলেই সৈনিকের শিক্ষা গ্রহণ করিত কেন?

২। আথেন্সবাসীর জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারে আথেন্সের দান কি তাহা লিখ।

৪। পেরিক্লিস কে? সক্রেটিস ও প্লেটোর সম্বন্ধে কি জান? আথেন্সের কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ঐতিহাসিকের নাম বল। [M.E. 1955]

৫। টীকা লিখ :

(ক) থ্যুকিডিডিস, (খ) হেরোডোটাস, (গ) পার্থেনন, (ঘ) পেরিক্লিস [M.E. 1968], (ঙ) সক্রেটিস্ [M.E. 1968] (চ) লাইকারগাস [M.E. 1967]

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) গ্রীসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুইটি নগর হইতেছে—এবং—। (খ) স্পার্টার—নামে একজন জ্ঞানী ও—ব্যক্তি ছিলেন। (গ) আথেন্সের বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক—সময়েই গ্রীক্ সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছিল। (ঘ) সক্রেটিস—ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এথেনীয়গণকে নূতন— —দিলেন। (ঙ) —ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। (চ) প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত বাগ্মী—, প্রসিদ্ধ সামরিক নেতা—আথেন্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭। আথেন্সের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ বিখ্যাত কেন? [M.E. 1957]

৮। স্পার্টা ও আথেন্সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা কেমন ছিল? ইহাদের মধ্যে, কোন্ দেশের ব্যবস্থা উন্নততর বলিয়া মনে হয়? [M.E. 1968]

ভারতবর্ষের এই অংশ হইতে দরায়ুস প্রতি বছর প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের সোনা কর হিসাবে পাইতেন। পারস্য সাম্রাজ্যের কোন অংশ হইতে এই পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত না। দরায়ুস তাঁহার বিজয়ের কাহিনী তিনটি বিভিন্ন ভাষায় বাহিস্তানের এক পর্বতের গায়ে খোদাই করাইয়াছিলেন। এই লিপির উপরের দিকে দরায়ুস শত্রুকে পদদলিত করিতেছেন, এইরূপ একটি মূর্তিও খোদাই করা আছে। এই সুবিশাল পারসিক সাম্রাজ্যের প্রধান নগরগুলির নাম ছিল সুসা, পার্সেপলিস, ইক্‌বাতানা ও সার্ডিস্।

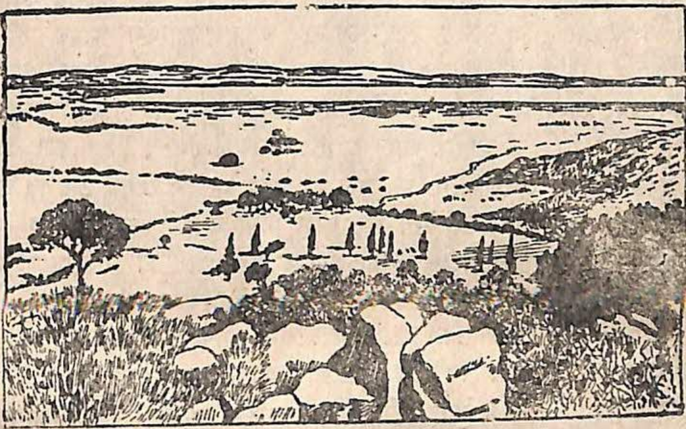


চিত্র ৪৮ : পারস্য

দরায়ুস ইওরোপের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দক্ষিণ রাশিয়ার শকজাতির বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয়।

দরায়ুস গ্রীসদেশ জয় করিবারও ইচ্ছা করেন। এইজন্য তিনি ফিনিসীয়দের জাহাজ সংগ্রহ করিলেন। তারপর একে একে ঈজিয়ান সাগরের গ্রীক্ দ্বীপগুলির বেশির ভাগ অংশই জয় করিলেন। পরে এই সকল পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত গ্রীক্ দ্বীপগুলির মধ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের সময় আথেন্সবাসীরা বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করে। আথেন্স এবং এই দ্বীপগুলির সৈন্যরা পারসিক সাম্রাজ্যের সার্ডিস নামক নগরী আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে। দরায়ুস এই সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি সমগ্র গ্রীসদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করিয়া আথেন্সবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। "ইতিহাসের জনক" হেরোডোটাসের লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দরায়ুসের এক রানী তাঁহাকে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান

প্রেরণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁহার প্রথম অভিযান সফল হইল না। তিনি পুনরায় এক অভিযান প্রেরণ করিলেন।



চিত্র ৪৯ : ম্যারাথনের যুদ্ধক্ষেত্র

এই বিরাট বাহিনী আথেন্সের নিকটবর্তী ম্যারাথনের প্রান্তরে উপস্থিত হইল। আথেনীয়দের নেতা ছিলেন মিল্‌টিয়াডিস্। তিনি স্পার্টার সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু স্পার্টানরা সময়মতো সাহায্য পাঠাইল না। এইরূপ জাতীয় বিপদে মিল্‌টিয়াডিস্ স্থির করিলেন যে, যদিও তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী বিশাল পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে না, তবু বিনা যুদ্ধে দেশ তিনি পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবেন না। তাহা অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই ভাল। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার সৈন্য সহ পারসিক বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অতর্কিত আক্রমণে পারসিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। তাহারা যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। তাহাদের মৃতের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। এই যুদ্ধ 'ম্যারাথনের যুদ্ধ' বলিয়া পরিচিত। এই যুদ্ধে আথেন্স-বাসীরা নিজেদের দেশরক্ষার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ম্যারাথনের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধ আথেন্সবাসীদের জাতীয় জীবনের এক অতি গৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় ঘটনা।

ইহার অল্পকাল পরেই দরায়ুসের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র জেরেক্সিস্ সম্রাট হইলেন। ম্যারাথনের যুদ্ধের দশ বছর পর তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে তৃতীয়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পারস্য সাম্রাজ্য : গ্রীসদেশের সহিত যুদ্ধ

পারস্যদেশের প্রাচীন ইতিহাস আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। পারস্যদেশের নিকটে মিডি নামক দেশে পারসিক জাতিরই এক শাখা বাস করিত। ইহাদের ইতিহাস খুব অল্পই জানা গিয়াছে। এক সময়ে ইহারা খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, আসিরীয় সাম্রাজ্য তাহাদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের একজন রাজা এক সময়ে ব্যাবিলনের প্রধান নগরী নিনেভে ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিডি রাজ্য অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। পারসিকগণ মিডিদিগের নিকট হইতেই তাহাদের ভাষা এবং অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। কলমের সাহায্যে পার্চমেণ্ট্ বা চামড়ার কাগজের উপরে লিখিবার উপায় পারসিকরা মিডিদের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল।

মিডি রাজ্য ও পারস্যদেশের মধ্যে বহুকাল যাবৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৫০ খ্রীঃ পূঃ) পারস্য সম্রাট সাইরাস মিডি অধিকার করেন এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান।

এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সীমায় লিডিয়া নামে একটি দেশ ছিল। এই দেশের রাজা ছিলেন ক্রেসাস্। ইনি সাইরাসের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভয় পান ও মিশর এবং স্পার্টার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। কিন্তু অবশেষে সাইরাসের সহিত যুদ্ধে ক্রেসাস্ পরাজিত হইলেন। ক্রেসাস্‌কে বন্দী হিসাবে সাইরাসের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। ক্রেসাসের তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সাইরাস তাঁহাকে নিজের পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করিলেন। লিডিয়া রাজ্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। এই দেশ জয় করিয়া সাইরাস যথেষ্ট সম্পদ্‌শালী হইলেন।

ইহার পর সাইরাস ব্যাবিলন আক্রমণ করেন। ব্যাবিলন নগরের বাহিরে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সাইরাস জয়ী হইলে ব্যাবিলন নগরের দ্বার সাইরাসের নিকট খুলিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার সৈন্যরা বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করে। সাইরাসের ব্যাবিলন দখল সম্পর্কে বাইবেলে এক অতি অদ্ভুত গল্প আছে। ঐ সময়ে ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন বেল্‌শাজার। ইনি ছিলেন রাজা নেবুনিডাসের পুত্র। বেল্‌শাজার একদিন এক ভোজসভায় আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে হঠাৎ একটি হাতকে দেয়ালের গায়ে কয়েকটি কথা লিখিতে দেখা গেল। কেবল হাতই দেখা গেল, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে দেখা

গেল না। সকলেই অবাক হইয়া রহিলেন। তাহারা দেখিলেন যে—'মেনে মেনে টেকেল্ উফার্সিন্ (Mene, Mene, Tekel, Upharsin)'—এই কয়েকটি কথা লেখা রহিয়াছে। দানিয়েল নামক ভবিষ্যৎবক্তা এই কথাগুলির অর্থ বলিতে সক্ষম হইলেন। এই কথাগুলির অর্থ হইল যে "ব্যাবিলনের রাজার রাজত্বের



চিত্র ৪৬ : সাইরাস



চিত্র ৪৭ : দরায়ুস

কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। কারণ, ভগবান বেল্‌শাজারকে অযোগ্য মনে করিয়াছেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য পারস্য এবং মিডি দেশের রাজাকে দেওয়া হইয়াছে।" কাজেও হইল তাহাই। সাইরাস খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে ব্যাবিলন দখল করিলেন।

সম্রাট সাইরাসের সাম্রাজ্য লিডিয়া হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাইরাসের পর তাঁহার পুত্র ক্যাম্বিসেস্ সম্রাট হইলেন। তিনি মিশর জয় করেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার সিংহাসন তাঁহার মন্ত্রীপুত্র প্রথম দরায়ুস লাভ করেন।

দরায়ুস পারস্য সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত করেন যে, ইহার পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্য আর কেহ অধিকার করেন নাই। তিনি রাশিয়ার ভল্‌গা নদী পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। ভারতবর্ষে নিজ সাম্রাজ্য আরও বাড়াইবার জন্য তিনি এক নৌঅভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানের ফলে তাঁহার সাম্রাজ্য রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বছর আগের কথা। পারস্যের সম্রাট তখন যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত। গ্রীসদেশে তখন সভ্যতা মাত্র গড়িয়া উঠিতেছে। ইতালির রোম নগরী মাত্র দেড়শত হইতে দুইশত বছর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সর্বদিকেই রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তখন এক ধর্মের বন্যা আসিয়াছিল।

ঐ সময়ে বৈদিক ধর্ম অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। কতকগুলি বাঁধা-ধরা ক্রিয়াকাণ্ড এবং পশুবলি তখন বৈদিক ধর্মের অপরিহার্য অংগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুরোহিত শ্রেণী এই সকল জটিলতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট দায়ী ছিলেন। অনেকের মনেই তখন সহজ ও সরল ধর্ম-পথ আছে কি না সেই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। মহাবীর এবং গৌতমের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাঁহারা নূতনভাবে ধর্মপালন করিবার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহাবীর :

গৌতম বুদ্ধের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে বিহারের কুন্দপুর নামক স্থানে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশলা। মহাবীর প্রথম জীবনে গৃহী ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল যশোদা। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। দীর্ঘ বার বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি এক নূতন সরল ধর্মপথের সন্ধান পান। তিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'জিন'। 'জিন' শব্দের অর্থ হইল 'জয়ী'—অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার ধর্মমতে বিশ্বাসীকে জৈন বলা হয়। আজও ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহু জৈনধর্মাবলম্বী আছেন। জীবহিংসা না করা, সত্য কথা বলা এবং সৎভাবে জীবন যাপন করা, জৈনধর্মের তিনটি মূল নীতি। মহাবীর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে 'পাবা' নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

গৌতম বুদ্ধ :

নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু নামে এক রাজ্য ছিল। শাক্য বংশের শুদ্ধোধন এই দেশের রাজা ছিলেন। সিদ্ধার্থ ছিলেন তাঁহার পুত্র।

সিদ্ধার্থ গৌতম নামেও পরিচিত ছিলেন। গৌতমের মাতার নাম ছিল মায়াদেবী। গৌতম রাজপুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য রাজপুত্রগণ হইতে তাঁহার প্রকৃতি ছিল একেবারে ভিন্ন। বাল্যকাল হইতে তিনি ছিলেন ধর্ম-ভাবাপন্ন। রাজপুত্রগণ সাধারণতঃ মৃগয়া, দিগ্বিজয় ইত্যাদিতেই আনন্দ



চিত্র ৫০ : মহাবীর



চিত্র ৫১ : গৌতম বুদ্ধ

পাইতেন, কিন্তু গৌতম এই সকল কিছুই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার এইরূপ ধর্মভাব দেখিয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে সংসারে মনোযোগী করিতে চাহিলেন। গৌতমের বিবাহ দেওয়া হইল। তাঁহার স্ত্রীর নাম গোপা। গৌতমের মন সংসারে আকৃষ্ট হইল না। তিনি জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিয়া মনে মনে দুঃখ পাইতে লাগিলেন। একবার তিনি রথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধ নিজের শরীরের ভার আর বহন করিতে পারিতেছিল না। তিনি এক ব্যক্তিকে রোগে কষ্ট পাইতে দেখিলেন ও একটি মৃত ব্যক্তির শবও তাঁহার চোখে পড়িল। এই সকল দেখিয়া তিনি জরা, রোগ-শোক ও মৃত্যুর হাত হইতে কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করা যাইতে পারে, সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসীর শান্ত এবং সৌম্য মূর্তি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন।

অভিযান শুরু করিলেন। জেরেক্সিসের বিশাল সৈন্যবাহিনীতে ৬৪টি দেশের লোক ছিল। বহু ভারতীয়ও সেই সেনাবাহিনীতে ছিল। এই বাহিনীর শ্রেষ্ঠ দশ হাজার সৈন্যের একটি দল গঠন করা হইয়াছিল। এই দলের সৈনিকরা যুদ্ধে অপরাজেয় ছিল বলিয়া তাহাদের নাম রাখা হইয়াছিল "অমর সৈনিক"। জেরেক্সিস্ 'হেলেস্‌পণ্ট' অর্থাৎ বর্তমান দার্দেনেলিস-প্রণালীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহা অতিক্রম করিবার জন্য একটি পুল নির্মাণ করিবার আদেশ দিলেন। পুল নির্মিত হইলে তাহা স্রোতে ভাসিয়া গেল। জেরেক্সিস্ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জলের উপর ৩০০ ঘা বেত মারিবার আদেশ দেন। তারপর তাঁহার নৌকাগুলিকে পর পর সাজাইয়া শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া একটি পুল তৈয়ার করা হয়। জেরেক্সিস পাহাড়ের উপর এক মার্বেল পাথরের সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার বিশাল বাহিনীর দার্দেনেলিস্ পার হওয়া পরিদর্শন করেন।

গ্রীসদেশ আক্রমণ করিবার আগে জেরেক্সিস্ নাকি গ্রীক্ রাজ্যগুলিতে দূত পাঠাইয়া পারস্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে আহ্বান জানান এবং তাহার নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেক দেশের একটু মাটি ও জল চাহিয়া পাঠান। বহু রাজ্য তাঁহার ভয়ে মাটি ও জল দিয়াছিল বটে, কিন্তু স্পার্টা ও আথেন্স তাহা দিতে অস্বীকার করে। এইজন্য জেরেক্সিস্ আথেন্স ও স্পার্টাকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে ডেল্‌ফি নামক স্থানের এপোলোর মন্দিরে গ্রীসের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এক দৈববাণী হয়। ইহাতে গ্রীসদেশে এক ভীতির সঞ্চার হয়। আথেন্স, স্পার্টা এবং অপরাপর দেশগুলি বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইল। তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী পারসিক সৈন্যগণকে বাধা দেওয়ার জন্য থার্মপলির গিরিপথের মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিল। গিরিপথ প্রশস্ত ছিল না। সেই কারণে এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতা স্পার্টার রাজা লিওনিডাস মাত্র তিনশত সৈন্য সহ সেইস্থানে রহিলেন। অপর সৈন্য তিনি অন্যত্র অপসারিত করিলেন। পারসিক বাহিনী এই সামান্য সংখ্যক স্পার্টান সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিনশত সৈন্য সহ লিওনিডাস যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে এই তিনশত সৈন্যের প্রত্যেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। লিওনিডাসও যুদ্ধে নিহত হইলেন। তিনশত স্পার্টান সৈন্যের আত্মত্যাগ দেশপ্রেমের এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিল। দেশের জন্য এইভাবে প্রাণদান করিয়া তিনশত স্পার্টান বীর অমর হইয়া রহিল। আজও থার্মপলির যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

ইহার পর আর্টেমিসিয়াম নামক স্থানের জলযুদ্ধেও গ্রীক্‌রা পরাজিত হইল। কিন্তু তারপর থেমিস্টক্লিস্ নামে আথেনীয় জনৈক নেতার নেতৃত্বে সালামিস নামক যুদ্ধে পারসিক নৌবাহিনী ধ্বংস হইল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারসিক বাহিনী দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ইহার পরও আথেন্সের নেতৃত্বে এক নৌবাহিনী পারসিকগণকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল। গ্রীক্‌দের হাতে পরাজিত হইলেও পারসিক সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইল না। ইহার পরেও প্রায় একশত বছর পারস্য সাম্রাজ্য টিঁকিয়া ছিল। অপর দিকে, পারসিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার ফলে গ্রীক্‌দের মনে নূতন প্রেরণা জাগিল। তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই আথেন্সের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ শুরু হইল।

আলোচনা

১। গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। পারসিক সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি জান লিখ।

৩। ম্যারাথন ও থার্মপলির যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান? [M.E. 1955]

৪। টীকা লিখ :
(ক) থার্মপলি [M.E. 1967] (খ) প্রাচীন ধারণা [M.E. 1967]

৫। পারস্য সম্রাট দরায়ুস কেন গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন?

৬। সালামিসের যুদ্ধে পারসিক নৌ-বহরের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। এক কথায় উত্তর দাও :
(ক) আসিরীয়ার রাজধানীর নাম কি? (খ) সাইরাসের পুত্রের নাম কি? (গ) জেরেক্সিস্-এর সৈন্যবাহিনীর নাম কি? (ঘ) গ্রীসের বিরুদ্ধে প্রথম পারসিক অভিযানের নায়ক কে ছিলেন? (ঙ) 'ইতিহাসের জনক' কাহাকে বলা হইত? (চ) ব্যাবিলনের রাজা কে ছিলেন এবং তিনি কাহার পুত্র ছিলেন?

৮। 'মেনে মেনে টেকেল্ উফারসিন্'—এই কথাগুলির অর্থ কি এবং কে এই কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন?

৯। জেরেক্সিস্ কে? গ্রীস আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1967]

১০। ম্যারাথনের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। [M.E. 1958]

১১। জেরেক্সিসের সৈন্যবাহিনী কিভাবে হেলেস্‌পণ্ট পার হইয়াছিল?

গৌতম যখন জীবের মুক্তির কথা মনে মনে ভাবিয়া দিন কাটাইতেছেন, ঐ সময়ে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল রাহুল। সংসারের মায়া দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে এক গভীর রাত্রিতে গৌতম গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর তিনি পরম সত্যের সন্ধানে দুইজন সন্ন্যাসীর সহিত ঘুরিলেন। তিনি নানাভাবে কঠোর তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল না। উরুবিল্ব নামে এক জায়গায় তিনি ঊনপঞ্চাশ দিন অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া তপস্যা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। কঠোর তপস্যার দ্বারা ফল লাভ হইবে না, তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি যখন ক্ষুধায় কাতর তখন সুজাতা নামে এক বণিক-কন্যা তাঁহাকে মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত করেন। পুত্রের জন্মদিনে সুজাতা ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের নীচে পূজা দিতে আসিয়া গৌতমকে দেখিতে পান। গৌতমের দেহ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে মিষ্টান্ন নিবেদন করেন।

অবশেষে গয়ার নিকট এক বট-বৃক্ষমূলে গৌতম একাকী নূতনভাবে তপস্যা আরম্ভ করেন। এইবার তিনি পরম-সত্য উপলব্ধি করেন। এই জ্ঞানলাভ করিবার ফলে তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী হইলেন। যে স্থানে বুদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা 'বোধগয়া' নামে পরিচিত। যে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি ধ্যান করিয়াছিলেন তাহার নাম হইয়াছিল 'বোধিবৃক্ষ'।

তিনি এই জ্ঞানলাভ করিলেন যে, কেবলমাত্র পূজা-অর্চনা দ্বারা মানুষ আত্মার শান্তি আনিতে পারে না, অথবা দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটাইতে পারে না। আত্মার শান্তিকে তিনি নাম দিয়াছিলেন 'নির্বাণ'। তিনি কর্মফলে বিশ্বাস করিতেন। এক জন্মের কর্মফল মানুষ পরজন্মে ভোগ করে। তাই তিনি ভাবিলেন, মনকে জয় করিয়া লোভ, হিংসা ইত্যাদি সব কিছু ত্যাগ করিতে পারিলেই মানুষ দুঃখ-কষ্টের অবসান করিতে পারিবে।

বুদ্ধের ধর্মমতে কোন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন ছিল না। কঠোর তপস্যা বা ইন্দ্রিয়াসক্তি এই দুইয়ের কোনটাই তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি ধর্ম ব্যাপারে একটি মাঝামাঝি পথ বাহির করিয়াছিলেন। সৎ-কাজ, সৎ-চিন্তা, সৎ-আলাপ, সৎ-চেষ্টা, সৎ-ব্যবহার, সৎ-জীবন, সৎ-আকাঙ্ক্ষা, এবং সৎ-মনোবৃত্তি—এই আটটি নীতি পালন করিলেই বুদ্ধের ধর্ম পালন করা হইল। ইহাই হইল তাঁহার মাঝামাঝি পথ। অহিংসা ছিল বুদ্ধের ধর্ম-মতের প্রধান নীতি। এইভাবে ধর্মপালন করিলেই মানুষ নির্বাণ লাভ করিতে—অর্থাৎ, দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

বুদ্ধের ধর্ম-মত বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। জ্ঞানলাভের পর বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদাবে আসেন এবং সেইখানে পাঁচজন ব্যক্তিকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। পরে তিনি বর্তমান বিহার এবং উত্তর প্রদেশের নানাস্থানে তাঁহার ধর্মপ্রচার করেন। রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলাবস্তু ইত্যাদি স্থানে তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দ, উপালির ন্যায় সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ বিম্বিসার পর্যন্ত অনেকেই তাঁহার শিষ্য হন। বণিক অনাথপিণ্ডদ, সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থাপন করেন। এইভাবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে বুদ্ধ কুশীনগর নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহ নামক স্থানে সম্মিলিত হন এবং বুদ্ধের ধর্মনীতিগুলি তিনটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তক তিনটি "ত্রিপিটক" নামে পরিচিত। এই তিনটি পিটকের নাম—সূত্র-পিটক, বিনয়-পিটক এবং অভিধর্ম-পিটক। পরবর্তী কালে বুদ্ধের বিভিন্ন পূর্বজন্মের ঘটনা জাতক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়।

আলোচনা

১। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কারণ কি ছিল?

২। মহাবীর কে ছিলেন? তাঁহার ধর্মমত সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। গৌতম বুদ্ধদেবের জীবনী এবং ধর্মমত সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। [M.E. 1954, 1961, 1968]

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মহাবীরের ধর্মমতে বিশ্বাসীদের—বলা হয়। তিনি প্রথম জীবনে—ছিলেন। (খ) বুদ্ধদেব বাল্যজীবনে—নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন—। (গ) মাত্র—বছর বয়সে গৌতম—করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি—নামে একস্থানে—দিন অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া —করিলেন। (ঘ) বুদ্ধদেব যে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন তাহার নাম হইল—। (ঙ) দীর্ঘদিন ধর্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব—বৎসর বয়সে—তিনি দেহত্যাগ করেন। (চ) বুদ্ধের ধর্মনীতিগুলি যে তিনটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, সেই পুস্তক তিনটি—নামে পরিচিত এবং সেই তিনটি পুস্তকের নাম যথাক্রমে—, —এবং—।

৫। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ৮টি নীতি কি কি?

৬। বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব লাভের গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

৭। সংক্ষেপে উত্তর দাও :
(ক) মহাবীরের পত্নীর নাম কি ছিল? (খ) মহাবীরের মাতা-পিতার নাম কি? (গ) 'জিন' শব্দের অর্থ কি? (ঘ) বুদ্ধদেবের মাতার নাম কি ছিল? (ঙ) বুদ্ধদেব কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (চ) বোধগয়া কাহাকে বলে? (ছ) 'নির্বাণ' কি? (জ) বুদ্ধদেবের প্রধান তিন শিষ্যের নাম বল। (ঝ) বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ঘটনাবলী কোন্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়?

৮। টীকা লিখ :
গৌতমবুদ্ধ [M.E. 1968]

নবম পরিচ্ছেদ

কন্‌ফুসিয়াস

বুদ্ধদেব যখন ভারতে তাঁহার বাণী প্রচার করিতেছেন, প্রায় সেই সময়ে চীনদেশেও এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। চীনদেশের অবস্থা তখন কতকটা ভারতবর্ষের মতোই ছিল। সমগ্র দেশটি তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় সর্বদাই লাগিয়া ছিল। ইহা ভিন্ন দেশের উত্তর সীমান্ত তখন অসভ্য জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এইরূপ অশান্তির মাঝখানে শান্তির বাণী শুনাইলেন চীনদেশের আদিগুরু কন্‌ফুসিয়াস।

কন্‌ফুসিয়াস ছিলেন অতি দরিদ্র পিতার সন্তান। তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার মতো সামর্থ্য তাঁহার পিতার ছিল না। কিন্তু কন্‌ফুসিয়াসের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ধনুর্বিদ্যা ও সংগীত শিক্ষা করেন। তাঁহার চেহারা দেখিতে ভাল ছিল না। তাঁহার পিঠ কুঁজো, ঠোঁট ষাঁড়ের মতো ও মুখখানা সমুদ্রের মতো ছিল—এইরূপ বলা হয়। অল্প বয়সেই কন্‌ফুসিয়াস তাঁহার পিতাকে হারাইলেন। ফলে, মায়ের ভরণ-পোষণের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি প্রথমে নিজের গৃহে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। আমাদের দেশের টোলের মতো তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার বাড়িতে বাস করিত এবং বিদ্যাশিক্ষা করিত। তিনি কাব্য, ইতিহাস এবং ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দিতেন। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে তিনি উপদেশ দিতেন। বহু রাজা ও রাজপুত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা-গ্রহণ করিতেন। শিক্ষাদানের জন্য তিনি সামান্য অর্থ গ্রহণ করিতেন। তিনি

সক্রেটিসের মতো মৌলিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া শিক্ষাদান করিতেন। পরে কিছুদিনের জন্য তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার, এমন কি, তাহাদের খাদ্য কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি আইন পাস করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরে তিনি এই চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

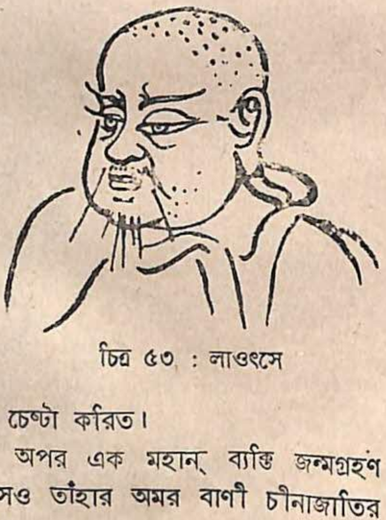
কিন্তু দেশের অশান্তিপূর্ণ অবস্থা তাঁহার মনকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে তিনি অশান্তি দূর করিবার পথের সন্ধান পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, স্বার্থ ত্যাগ না করিলে কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব নহে। তিনি দেশবাসীকে এই উপদেশ দিতে



চিত্র ৫২ : কন্‌ফ্‌ুসিয়াস

লাগিলেন যে, জীবনের সম্মুখে মহান্‌ আদর্শ রাখিয়া চলা প্রয়োজন। সেই আদর্শ সাধনের জন্য সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, তবে ঝগড়া, বিবাদ বা অশান্তি দূর হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইভাবে ধর্ম এবং রাজনীতি দুইদিকেই তিনি মানুষের

চলার সত্যিকার পথের সন্ধান দিলেন। চরিত্র-গঠনের উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন। তিনি হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অপরের মতামতের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি চীনাবাসিদের সমাজের দোষত্রুটি দূর করিয়া সমাজকে উন্নত করিবার উপদেশ দিলেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী না হইয়া সংসারে থাকিয়া মানুষের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত, এই কথা তিনি বলিতেন। বহুলোক তাঁহার নীতি মানিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার মতের বিরোধিতা করিবার লোকেরও অভাব হইল না। যাহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িল, তাহারা কন্‌ফুসিয়াসকে নানাভাবে বিব্রত করিতে লাগিল। এইভাবে সারাজীবন দেশের এবং দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়া তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার বাণী অমর হইয়া রহিল। তাঁহার লেখা চারখানি ধর্মগ্রন্থ এবং পাঁচখানি মহাকাব্য পরবর্তী চীনা-সাহিত্যের উৎসস্বরূপ হইল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য কয়েকজনের মৃত্যুতে শেষ জীবনে তিনি খুব দুঃখ পাইয়াছিলেন।


চিত্র ৫৩ : লাওৎসে

কন্‌ফুসিয়াসের চরিত্রের নির্মলতা, তাঁহার কার্যকলাপ এবং রচিত পুস্তকগুলি চীনাজাতির উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত চীনবাসীরা এক অতি উন্নত ধরনের নাগরিকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শে চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করিত।

চীনদেশে কন্‌ফুসিয়াসের সময়েই অপর এক মহান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম লাওৎসে। লাওৎসেও তাঁহার অমর বাণী চীনাজাতির কল্যাণের জন্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এই কন্‌ফুসিয়াস ও লাওৎসের দেশ চীনে পরে ভারতবর্ষের বুদ্ধের বাণীও প্রচারিত হইয়াছে। চীনের বহুসংখ্যক লোক আজ পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। কথিত আছে, এক চীন সম্রাট স্বপ্নে এক অতি সৌম্য উজ্জ্বল দেবমূর্তি দেখেন। নানাদিকে খুঁজিয়া সেই রকম কোন মানুষ বা মূর্তি পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য তিনি স্বপ্নের সেই মূর্তির বর্ণনা সহ বহু দূত পাঠাইলেন। দূতেরা বুদ্ধের মূর্তি লইয়া আসিল, সম্রাট সেই মূর্তিই স্বপ্নে দেখিয়াছেন বলিলেন। এইভাবে বুদ্ধদেব চীনদেশে পূজিত হইলেন। চীনা-

বাসিগণ মনে করেন যে, বুদ্ধ কন্‌ফুসিয়াস ও লাওৎসে একই শক্তির তিন অংশ মাত্র।

আলোচনা

১। কন্‌ফুসিয়াস কে? তাঁহার জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। [M.E. 1955]
২। কন্‌ফুসিয়াসের আকৃতি বর্ণনা কর। ছাত্রদিগকে তিনি কি শিক্ষা দিতেন?
৩। কন্‌ফুসিয়াস শাসনকর্তা হইবার পর তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন করিয়াছিলেন?
৪। কন্‌ফুসিয়াসের ধর্মমত কি ছিল?
৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) কন্‌ফুসিয়াসের প্রকৃত নাম ছিল—। (খ) মানুষের দুই গুণের উপর কন্‌ফুসিয়াস জোর দিতেন—ও—। (গ)—খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। (ঘ) অধ্যয়নের সঙ্গে কন্‌ফুসিয়াস—ও—শিখিয়াছিলেন।
৬। বুদ্ধদেব চীনদেশে কিভাবে পূজিত হইয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে যে গল্পটি আছে নিজের ভাষায় লিখ।
৭। টীকা লিখ : কন্‌ফুসিয়াস [M.E. 1961]

দশম পরিচ্ছেদ

আলেকজাণ্ডার, পুরু ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

স্পার্টা এবং আথেন্সের মধ্যে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার ফলে উভয় দেশই দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই সময়ে উত্তর অঞ্চলে ম্যাসিডন নামে আর এক রাজ্য ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। দ্বিতীয় ফিলিপ ম্যাসিডন রাজ্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলেন। ঐ সময়ে অপরাপর গ্রীক রাজ্যগুলি দুর্বল ছিল। সুযোগ পাইয়া তিনি সারা গ্রীসদেশকেই তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইবারও ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাহার আগেই তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডার রাজা হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। আলেকজাণ্ডার খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলের নিকট শিক্ষালাভ করেন। নূতন রাজার বয়স অল্প দেখিয়া সমগ্র গ্রীসদেশে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিল। আলেকজাণ্ডার তাহাতে মোটেই দমিলেন না। তিনি দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অপর স্থানে বিদ্রোহ

দমন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। সমগ্র গ্রীসদেশ আবার ম্যাসিডনের অধীন হইল।

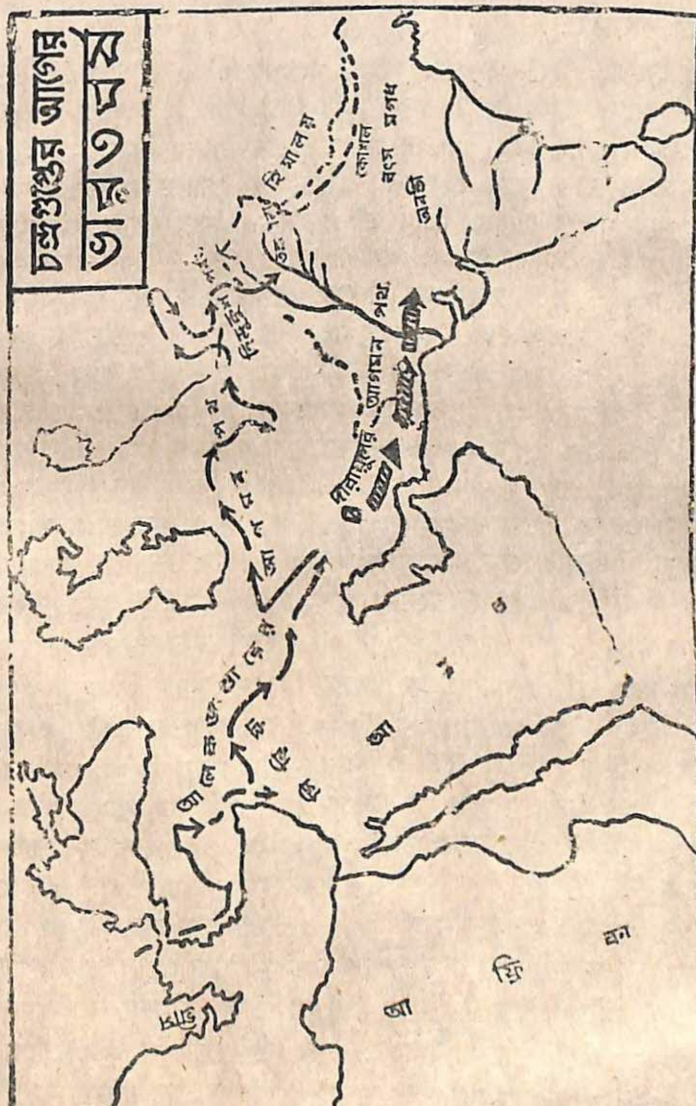
গ্রীসদেশে শান্তি স্থাপন করিয়া আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। এই পারস্যই একদিন গ্রীস জয় করিবার জন্য অভিযানের পর অভিযান প্রেরণ করিয়াছিল। আজ পারস্য সাম্রাজ্য গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক আক্রান্ত হইল। কয়েকটি যুদ্ধে পারস্য সম্রাট পরাজিত হইলেন। তৃতীয় দরায়ুস ছিলেন তখন পারস্যের সম্রাট। তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সকলেই আলেকজাণ্ডারের কবলে পড়িলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁহাদিগকে সসম্মানে দরায়ুসের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য রাজ্য জয় করেন। তারপর একে একে টায়ার, সীডন, ব্যাবিলন, ব্যাক্ট্রিয়া ইত্যাদি সকল দেশই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। আলেকজাণ্ডার ক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার দিগ্বিজয়ের কালে যেমন বহু নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তেমনি তিনি বহু নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরগুলি এশিয়া এবং ইওরোপের সভ্যতার এক-একটি মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল। মিশরে তিনি একটি শহর স্থাপন করেন। এই শহরের নাম তাঁহার নামানুসারে রাখা হইল আলেকজাণ্ড্রিয়া। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে আলেকজাণ্ড্রিয়া একদিন বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিল।



চিত্র ৫৪ : আলেকজাণ্ডার

অবশেষে খৃীঃ পূঃ ৩২৭-২৬ অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মগধে নন্দবংশের এক শক্তিশালী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতীয় রাজ্যগুলি অত্যন্ত দুর্বল

ছিল। এই জাতীয় দুর্দিনে একযোগে তাঁহারা দেশরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন না। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের পক্ষে যোগ দিলেন। অন্যান্য রাজারা একে একে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজের প্রাণ



চিত্র ৩৩ : চন্দ্রগুপ্তের আগের ভারতবর্ষ

বাঁচাইলেন। কিন্তু ঝিলাম নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একজন রাজা এইরূপ হীনভাবে নিজের স্বাধীনতা হারাইতে চাহিলেন না। তিনি আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলেন। এই রাজার নাম পুরু।

পুরুরাজার কাহিনী :

পুরু দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে মরণপণ করিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যসহ ঝিলামের তীরে উপস্থিত হইলেন। আলেকজাণ্ডার ঝিলামের অপর তীরে ছিলেন। পুরুর সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া তিনি ঝিলাম নদী পার হইতে সাহস পাইলেন না। তিনি কৌশলে পুরুরাজকে পরাস্ত করিতে মনস্থ করিলেন। এক গভীর রাত্রিতে তিনি তাঁহার সৈন্য-শিবিরে মশাল জ্বালাইয়া রাখিলেন। পুরুর সৈন্যরা ভাবিল অন্যান্য রাত্রির মতো আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার সৈন্যগণ তাঁবুতেই রহিয়াছেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার রাত্রির অন্ধকারে প্রায় সতর মাইল দূরে একস্থানে গোপনে নদী পার হইলেন। পুরু সেই খবর পাইলেন না। হঠাৎ যখন আলেকজাণ্ডারের সৈন্য নিকটবর্তী হইল, তখন পুরু বুঝিতে পারিলেন যে, আলেকজাণ্ডার সুকৌশলে অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। পুরু অবিলম্বে তাঁহার পুত্রকে কতক সৈন্যসহ আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। নিজে বাকী সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পুরুর পুত্র আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া পুরু সৈন্যসহ আলেক-জাণ্ডারকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব রাত্রির বৃষ্টিতে পুরুর রথের চাকা কাদায় অচল হইয়া পড়িল। তাঁহার অশ্বারোহী তীরন্দাজগণও কাদায় আশানুরূপ যুদ্ধ করিতে পারিল না। পুরু নিজে পদাতিক সৈন্যসহ যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। তাঁহার শরীরের নয়টি স্থান শত্রুর আঘাতে কাটিয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা হইল। বীর পুরু যুদ্ধে পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহাতে আলেকজাণ্ডার নিজেও মুগ্ধ হইলেন। আলেকজাণ্ডার বুঝিলেন যে, এইরূপ বীরের রাজ্য দখল করিলে সেই অধিকার স্থায়ী হইবে না। সেইজন্য তিনি পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। পুরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার আর মগধের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। পাঞ্জাব অঞ্চলে আলেকজাণ্ডার যে কয়টি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেইখানে ফিরিয়া গ্রীক্ শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন। তারপর তিনি দেশে চলিলেন। পথে ব্যাবিলনে অকস্মাৎ তাঁহার জ্বর হইল। এই জ্বরেই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাহিনী :

আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক যুবক যুদ্ধ শিক্ষার জন্য তাঁহার শিবিরে আসেন। এই যুবকের নির্ভীক আচরণ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের ভাল লাগিল না। তিনি তাই যুবককে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু বন্দী করিবার আগেই যুবক কৌশলে পলায়ন করিলেন। এই যুবকের নাম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলীবন নামক স্থানের এক ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। তখন নন্দরাজগণের অত্যাচারে দেশের লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এইরূপ অবস্থা দূর করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে একতাবদ্ধ করিতে তিনি মনস্থ করিলেন। ঐ সময়ে তিনি চাণক্য নামে তক্ষশিলার এক অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে আসেন। চাণক্য, কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত ইত্যাদি নামেও এই ব্রাহ্মণ পরিচিত। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রথমে বিন্ধ্য পর্বতের কতিপয় পার্বত্যজাতির লোক লইয়া চন্দ্রগুপ্ত এক সেনাদলের সৃষ্টি করেন। এই সামান্য শক্তির সাহায্যে তিনি নন্দরাজকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই আলেকজান্ডারের মৃত্যুসংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছে। এই সংবাদ পাওয়ার পরেই তিনি পাঞ্জাবে আলেকজান্ডার কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য জয় করেন। এইভাবে তিনি তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ক্রমে তিনি হিন্দুকুশ হইতে মহীশূর পর্যন্ত সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হন।

অপর দিকে আলেকজান্ডারের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণ ভাগ করিয়া লইলেন। সীরিয়া হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়িল। তিনি পাঞ্জাব পুনরায় অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। এইবার তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বীরের সম্মুখীন হইতে হইল। ভারত এখন আর বিচ্ছিন্ন ছিল না। অনায়াসে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করিলেন। সেলুকাস সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, মকরান, হিরাট—এই চারিটি প্রদেশ দান করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা ভিন্ন উভয় পক্ষের মধ্যে এক বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বলা হয় যে, সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে সঠিক কোন খবর জানা যায় নাই। চন্দ্রগুপ্তও সেলুকাসকে পাঁচশত হাতী দান করিয়া তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করেন।

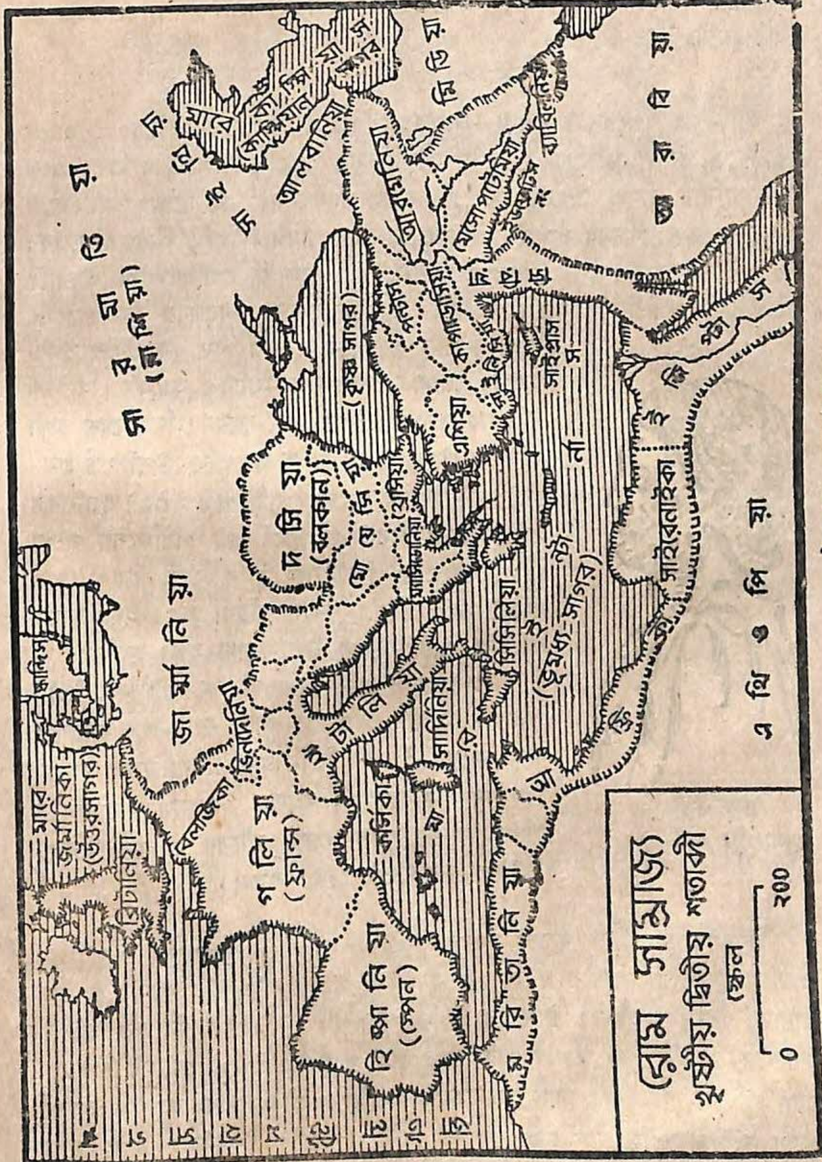
রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ার হইল। যে সকল নূতন রাজ্য জয় করা হইল, সেই সকল রাজ্যের অধিবাসিগণকে রোমের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে খ্রীঃ পূঃ ৮৯ অব্দে সমগ্র ইতালি রোমের অধীনে আসিল এবং ইতালির প্রত্যেক স্বাধীন প্রজা রোমের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইল।

সমগ্র ইতালির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াও রোমের রাজ্যবিস্তারের সাধ মিটিল না। ঐ সময় পশ্চিম ভূমধ্যসাগর-অঞ্চল কার্থেজ নামক এক দেশের অধীন ছিল। কার্থেজ আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত। রোম পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহিলে কার্থেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রোম এবং কার্থেজের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। রোম ও কার্থেজের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে (খ্রীঃ পূঃ ২৭০) কার্থেজ পরাজিত হইল। কার্থেজের সেনাপতি ছিলেন হ্যামিলকার বার্কা। হ্যামিলকার একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ফলে সিসিলি দ্বীপ রোমের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ইহার পর রোম কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া নামক দ্বীপ দুইটি অধিকার করিয়া লইল। সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্ণ উদ্যমে চলিল।

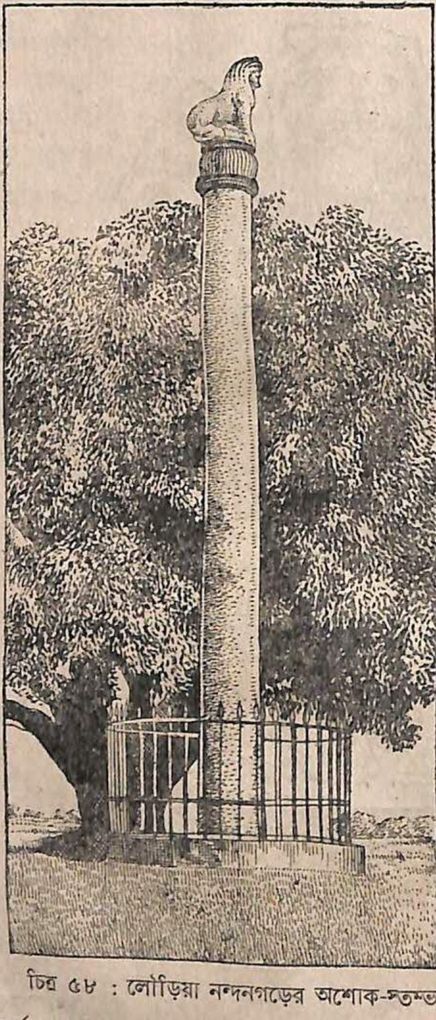
এদিকে হ্যামিলকার প্রথম পিউনিক যুদ্ধের অপমান ভুলেন নাই। তিনি তাঁহার বালক পুত্র হ্যানিবলকে সঙ্গে লইয়া স্পেনে গেলেন। স্পেনের কয়েকটি শহর তখন কার্থেজের অধীনে ছিল। স্পেন হইতে স্থলপথে রোম আক্রমণ করাই ছিল হ্যামিলকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার নিজের জীবনে হয়তো সেই আশা সফল হইবে না, সেইজন্য তিনি তাঁহার এগার বৎসর বয়স্ক পুত্র হ্যানিবলকে রোমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে বলিলেন। বালক হ্যানিবল শপথ গ্রহণ করিলেন। হ্যানিবল ছেলেবেলা হইতেই সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আলেকজান্ডারের ন্যায় সেনানায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

হ্যামিলকার মারা যাইবার আগেই সমগ্র স্পেন তাঁহার অধীনে আসে। হ্যানিবল যখন ক্ষমতা পাইলেন, তখন তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সবই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বে রোম এবং স্পেনের মধ্যে এক চুক্তিতে এব্রো নদীকে দুই দেশের সীমা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইহাও স্থির ছিল যে, স্পেন বা রোম কোন দেশই এই নদী অতিক্রম করিবে না। হ্যানিবল এই শর্ত ভাঙিলেন। তিনি এব্রো পার হইয়া



চিত্র ৭২ : রোম সাম্রাজ্য

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অপর কোন ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা দেখান নাই। তিনি ব্রাহ্মণ এবং জৈন সন্ন্যাসীদিগকেও সম্মান করিতেন। পরধর্মের প্রতি লোকে যাহাতে শ্রদ্ধাশীল হয়, সেইজন্য অশোক তাঁহার শিলালিপিতে বলিয়াছেন : "আপ্ত পাসংড পূজা ব পর পাসংড গরহা ব নো ভবে" অর্থাৎ নিজ ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য পরধর্মের যেন নিন্দা না করা হয়।


চিত্র ৫৮ : লৌড়িয়া নন্দনগড়ের অশোক-স্তম্ভ

এইভাবে প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করিয়া মহামতি অশোক দেহত্যাগ করেন। তিনি রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন। তিনি রাজগণের কর্তব্যের এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসকল রাজার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি, তাঁহাদের মধ্যে অশোকের স্থান সর্বোচ্চে। সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা অপর কোন রাজা এইভাবে ভাবেন নাই। অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের এক ক্ষুদ্র অঞ্চল হইতে দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ ছিল। অশোক তাহা দূর

করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্রে এক ধর্মসভা ডাকিয়াছিলেন। এই সভায় আলোচনার পর সেই সকল মতভেদ দূর করা হইল। অশোক বুদ্ধের



চিত্র ৫৯ : মৌর্য সাম্রাজ্য

প্রকৃত বাণী জগৎবাসীর নিকট প্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন। অশোক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

মাতা তাঁহাদের সন্তান হারাইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত-গঙ্গা বহিয়া গেল। যুদ্ধের পরেও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অসংখ্য লোক মরিল। এইসব দেখিয়া অশোকের প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগিল। তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। তিনি চিরকালের জন্য যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন।

উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, লোভে সুখ নাই, হিংসায় শান্তি নেই। এই সময় হইতে তিনি এক নূতন জীবন গ্রহণ করিলেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন না বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রজার মঙ্গল-সাধনই হইল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। তিনি মৃগয়া ইত্যাদি রাজকীয় আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে বাহির হইলেন। তাঁহার এই প্রচার-ভ্রমণ ধর্মযাত্রা নামে পরিচিত। বুদ্ধের বাণী তিনি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া দিলেন। এই সকল লিপিকে শিলালিপি বলা হয়। তাহা ছাড়া, তিনি নানাস্থানে স্তম্ভের গায়ে বুদ্ধের বাণী খোদাই করিয়া দিলেন। এইগুলিকে স্তম্ভলিপি বলা হয়। তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে একদল কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তিনি কেবলমাত্র নিজ দেশে ধর্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি সুদূর মিশর, ইরান, গ্রীস, সিরিয়া ইত্যাদি দেশেও ধর্ম প্রচারের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাইলেন।



চিত্র ৫৬ : অশোক

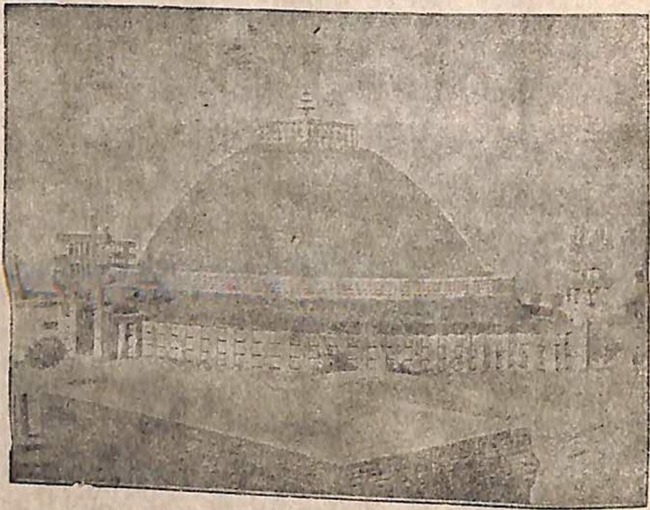
তিনি বলিলেন,"সব মুনিসে পজা মমা"—অর্থাৎ, সকল মানুষই আমার সন্তান। তিনি মানুষ মাত্রেরই কল্যাণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। এমন কি, পশু-পক্ষীর সেবাও তাঁহার কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি মানুষের ইহজগতের মঙ্গলসাধন করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন না, পরবর্তী জীবনেও যাহাতে তাহারা উন্নত হইতে পারে সেইজন্যও তিনি চেষ্টা করিতেন। মানুষ ও পশু-পক্ষী ইত্যাদির সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ এবং কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পশু এবং মানুষের চিকিৎসার জন্য তিনি চিকিৎসা-লয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক বহু স্তম্ভ ও স্তূপ নির্মাণ করেন। এইগুলির গঠন ও কারুকার্য আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। দিল্লী, লৌড়িয়া

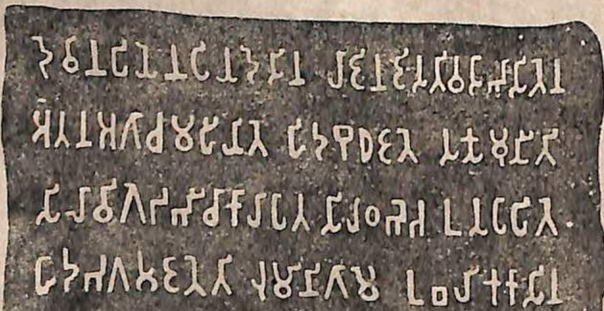


চিত্র ৫৭ : সারনাথের অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষ

নন্দনগড়, এলাহাবাদ, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে বহু অশোক-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সারনাথের স্তম্ভের উপরের সিংহমূর্তি ও ধর্মচক্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।



চিত্র ৬০ : সাঁচীস্তূপ



চিত্র ৬১ : অশোকের শিলালিপি

আলোচনা

১। মহামতি অশোকের প্রথম জীবন কিরূপ ছিল?
২। সম্রাট অশোক কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন? কোন্ যুদ্ধের প্রভাবে তিনি অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং কেন?
৩। অশোক কে ছিলেন? প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন?
৪। ধর্মপ্রচারের জন্য মহামতি অশোক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন? [M.E. 1956]
৫। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? [M.E. 1954]
৬। অশোককে 'আদর্শ রাজা' বলা হয় কেন? [M.E. 1952, '54]
৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক)—বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অশোক। তাঁহার পিতার নাম—।
(খ) অশোক—নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।
(গ) ধর্মপ্রচারের জন্য সম্রাট অশোক—নামে একদল—নিযুক্ত করিলেন।
(ঘ) সিংহলে সম্রাট অশোক নিজের পুত্র—ও কন্যা—ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মপ্রচারের ফলে—উন্নতি ঘটিয়াছিল।
(ঙ)—স্তম্ভের উপরের সিংহমূর্তি ও—স্বাধীন ভারতের জাতীয়—হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।
৮। মেগাস্থিনিস কখন এদেশে আসেন? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিবৃত কর। [M.E. 1967]
৯। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তাঁহার বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি জানা যায়? [M.E. 1968]
১০। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ সংক্ষেপে লেখ। এই অভিযানের ফল কি হইয়াছিল? [M.E. 1970]
১১। টীকা লিখ :
অশোক [M.E. 1967]

সময়-নির্দেশ

আর্য জাতির বসতি বিস্তার	...খ্রীঃ পূঃ ৩০০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ
ভারতীয় আর্য সভ্যতা	... " " ২০০০— ৬০০ " "
ইরান বা প্রাচীন পারস্য	... " " ২০০০— ৩০০ " "
প্রাচীন গ্রীস	... " " ১৫০০— ২৭৯ " "
পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত গ্রীসের সংঘর্ষ :	
প্রথম পারসিক অভিযান	...খ্রীঃ পূঃ ৪৯২
দ্বিতীয় " "	... " " ৪৯০
ম্যারাথনের যুদ্ধ	... " " ৪৯০
তৃতীয় পারসিক অভিযান	... " " ৪৮০
থার্মপলির যুদ্ধ	... " " ৪৮০
স্যালামিসের যুদ্ধ	... " " ৪৮০
গৌতম বুদ্ধের যুগ	...খ্রীঃ পূঃ (জন্ম) ৫৬৬—৪৮৬ (মৃত্যু)
কন্‌ফুউসিয়াসের যুগ	...গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক
আলেকজাণ্ডার	...খ্রীঃ পূঃ (জন্ম) ৩৫৬—৩২৩ (মৃত্যু)
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (রাজত্বকাল)	খ্রীঃ পূঃ ৩২২—৩০০ খ্রীঃ পূঃ।
অশোক "	...খ্রীঃ পূঃ ২৭৩—২৩২ খ্রীঃ পূঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান : হ্যানিবলের কাহিনী

রোমের উত্থান :

খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দে টাইবার নদীর তীরে পাহাড়ের উপর রোম নগরী স্থাপিত হয়। রেমাস এবং রম্যুলাস নামে দুই ভ্রাতা এই নগরী স্থাপন করেন। রম্যুলাসের নাম হইতে ইহার নাম হয় 'রোম'।

রোম নগরীর স্থাপন সম্পর্কে এক অতি অদ্ভুত কাহিনী আছে। প্রাচীন ইতালির আল্‌বালঙ্গা নামক স্থানের রাজা ছিলেন নামিটর। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার মেয়ের দুই ছেলে ছিল। তাহাদের নাম রেমাস ও রম্যুলাস। নামিটরের মৃত্যুর পর এই দুই ভ্রাতার একজন আল্‌বালঙ্গার সিংহাসন পাইবে এইরূপ আশা ছিল। কিন্তু নামিটরের ভ্রাতা এমুলিয়াস নামিটরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হন। ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসন লইয়া যাহাতে কোন গোলযোগ না হইতে পারে সেইজন্য তিনি রেমাস ও রম্যুলাসকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করেন। এক নেকড়ে বাঘিনী এই দুই ভ্রাতাকে নিজ দুগ্ধ পান করাইয়া বাঁচায়। পরে তাঁহারা বড় হইয়া এমুলিয়াসকে উপযুক্ত শাস্তি দেন এবং তাঁহাদের মাতামহ নামিটরকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহারা নিজেদের জন্য অপর এক রাজ্য স্থাপন করেন। রম্যুলাস সামান্য অপরাধের জন্য রেমাসকে হত্যা করেন। ইহার পর তিনি রোমের প্রথম রাজা হিসাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

প্রাচীন ইতালি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রম্যুলাস সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল রাজ্য দখল করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার পরবর্তী রাজারাও রোমের রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে রোমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা তখন ছিল সিনেট নামে অভিজাত-সভার হাতে। জনসাধারণ শাসনকার্যে কোন অংশ পাইত না। রোমের লোক পেট্রিশিয়ান এবং প্লেবিয়ান্ নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পেট্রিশিয়ানগণই ছিলেন সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার একমাত্র অধিকারী। জনসাধারণ তাই তাঁহাদের অধিকারের জন্য বহুকাল আন্দোলন করেন। অবশেষে তাঁহারা শাসনকার্যে অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন।

প্রজাতন্ত্রের আমলেও রাজ্যবিস্তার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইতালির অন্যান্য রাজ্যগুলি রোমের অধীনে আসিল। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

সেগাণ্টাম্ নামক শহর দখল করিলেন। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধও আরম্ভ হইল (খ্রীঃ পূঃ ২১৮)।

হ্যানিবল পিরেনীজ এবং আল্‌পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া সৈন্যসহ ইতালিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দীর্ঘ পনর বছর ইতালিতে থাকিয়া একে একে চারিটি যুদ্ধে রোমের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধগুলির মধ্যে ট্রাস্‌মীন এবং ক্যানের যুদ্ধই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ক্যানের যুদ্ধের পর হইতেই হ্যানিবলের পরাজয় আরম্ভ হয়। নোলা, বেনিভেণ্টাম্ ইত্যাদি কয়েকটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। রোমান সৈন্য দেশরক্ষার জন প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে যুদ্ধের গতি ফিরাইতে সক্ষম হইল। রোমান সেনাপতি সিপিও কার্থেজ আক্রমণ করিবার জন্য আফ্রিকা গমন করেন। নিজ দেশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হ্যানিবল কার্থেজে উপস্থিত হন। সেইখানে জামা'র যুদ্ধে (খ্রীঃ পূঃ ২০২) হ্যানিবল সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয়। রোম কার্থেজের নৌবহর দখল করিয়া লয়। ইহা ছাড়া, কার্থেজ রোমকে কর দিতে বাধ্য হয়। হ্যানিবলকে রোমানগণ বন্দী করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি পলায়ন করেন। অবশেষে, পাছে রোমানগণ তাঁহাকে বন্দী করে এই ভয়ে তিনি বাইথিনিয়া নামক স্থানে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল শ্রেষ্ঠ বীরের পরিচয় আমরা পাই, হ্যানিবল তাঁহাদের একজন।



চিত্র ৬৩ :
সেনাপতি হ্যানিবল

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোম ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। গ্রীস, এশিয়া-মাইনর ইত্যাদি স্থানে রোমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। মিশরের উপরও রোমের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ছাপান্ন বছর বাদে কার্থেজ আবার রোমের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রোম কার্থেজকে পরাজিত করিয়া এবং কার্থেজ নগরী ধ্বংস করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। ইহা তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬)।

আলোচনা

১। রোমের সহিত কার্থেজের যুদ্ধের কারণ কি? হ্যানিবলের ইতালি-অভিযান বর্ণনা কর। কিভাবে হ্যানিবলের পরাজয় ঘটে? [M.E. 1957]

২। রোমের উৎপত্তি ও গোড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৩। রোম নগরীর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে যে গল্পটি আছে তাহা নিজের ভাষায় বল।

৪। কার্থেজের পরাজয়ের ফলে রোমের কি কিছু লাভ হইয়াছিল? যদি হইয়া থাকে কি লাভ হইয়াছিল, বল।

৫। হ্যানিবল কোন্ উপায় অবলম্বনে রোম আক্রমণ করেন এবং তথায় কতকাল ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল?

৬। হ্যানিবল কে? সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত বল। [M.E. 1955]

৭। 'পিউনিক যুদ্ধ' কি?

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও :
(ক) 'রোম নগর' নাম হইল কেন? (খ) রোমের লোক কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল এবং শ্রেণীগুলির কি কি নাম হইয়াছিল? (গ) প্রথম পিউনিক যুদ্ধ বাধিবার কারণ কি? (ঘ) কোন্ যুদ্ধের পর হইতে হ্যানিবলের পরাজয় শুরু হয়? (ঙ) কার্থেজ কি?

৯। রোম এবং কার্থেজের মধ্যে কয়বার যুদ্ধ হইয়াছিল? দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

১০। হ্যানিবলের পিতা হ্যানিবলকে কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন? সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে তিনি কিভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী রোমে নাগরিক জীবন : রোম ও ভারতের যোগাযোগ

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত কার্থেজ জয় করিয়া রোম পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য বিস্তার করিল। ইহাতে রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার শেষ হইল না। ক্রমে ক্রমে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ইওরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া, এই তিন মহাদেশের বহুস্থান রোম সাম্রাজ্যের অধীনে আসিল। মিশর, মেসোপটামিয়া, গ্রীস, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন ইত্যাদি নানাদেশ তখন রোম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সহজ ছিল না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এই বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্যা দূর করিতে অক্ষম

বাহ্লিক গ্রীক্‌গণ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তাহাদের মুদ্রা হইতে আমরা কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। বাহ্লিক গ্রীক্‌গণ বর্তমান আমুদরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। তাহাদের রাজা ডিমিট্রিয়াস্‌ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের কতক অংশ দখল করেন। বাহ্লিক গ্রীক্‌গণের মধ্যে মিনন্দর ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজা। তিনি অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বাহ্লিক গ্রীক্‌গণের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের পতন আরম্ভ হয়। মিনন্দর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "মিলিন্দপঞ্‌হ"—অর্থাৎ মিলিন্দের প্রশ্ন,—নামক একখানা বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। কথিত আছে যে, তাহাতে ধর্ম সম্পর্কে মিনন্দরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে।

বাহ্লিক গ্রীক্‌গণের পর শকজাতি ভারতবর্ষে আসে। অহারা উত্তরে তক্ষশিলা, মথুরা, উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ ইত্যাদি স্থানে অধিকার স্থাপন করে। শকগণের মধ্যে উজ্জয়িনীর অধিপতি রুদ্রদমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

শকগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে পার্থিয়ান্‌ বা পহ্লবগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাহারা বর্তমান পারস্য দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজত্ব করিত। ক্রমে তাহারা বর্তমান আফগানিস্তানের কয়েকটি অংশ জয় করিয়া ভারতবর্ষে আসে। পহ্লব রাজগণের মধ্যে গণ্ডফার্নিস্‌ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। যীশু খ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেণ্ট্‌ টমাস্‌ ঐ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। এই কিংবদন্তী অনুসারে সেণ্ট্‌ টমাস্‌ গণ্ডফার্নিস্‌কে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সেণ্ট্‌ টমাস্‌ গণ্ডফার্নিসের আমলে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য—পাঞ্জাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহা হয়ত সত্য।

পহ্লবগণের পরে কুষাণগণ ভারতবর্ষে আসে। তাহারা মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল হইতে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করে। কুষাণগণ মধ্য-এশিয়ার তুর্কী যাযাবর জাতির এক শাখা। এই যাযাবরগণ 'ইউচি' জাতি বলিয়া পরিচিত। কুষাণগণ উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

প্রথম কদ্‌ফিসিস্‌ ছিলেন কুষাণ রাজত্বের স্থাপয়িতা। তারপর রাজা হন দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌। ইঁহারা উভয়েই ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌ চীনদেশের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং চীনদেশের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী

রাজা কণিষ্কই ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। ইনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের খাস্‌গড়, ইয়ারখন্দ্‌ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্য পূর্বে বারাণসী এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কণিষ্ক চীনদেশের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং চীন-সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যও জয় করেন। তাঁহার আমলে গ্রীস, রোম, চীনদেশ ইত্যাদির সহিত ভারতবর্ষের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর—বর্তমান পেশোয়ার। তাঁহার আমলে ভাস্কর্য, সাহিত্য, চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুরই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। চরক ছিলেন কণিষ্কের রাজবৈদ্য বা চিকিৎসক। ঐ সময়ের বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, নাগার্জুন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অশ্বঘোষ ছিলেন একজন কবি, নাট্যকার এবং দার্শনিক। তিনি বুদ্ধদেবের একখানা বিখ্যাত জীবনী রচনা করেন। নাগার্জুন বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশে গান্ধার নামক স্থানে এক অতি উন্নত ধরনের ভাস্কর্য-শিল্প তখন গড়িয়া উঠিয়াছিল।



চিত্র ৬৭ : কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

কুষাণগণ প্রথমে নানাধর্ম মিশাইয়া এক অদ্ভুত রকমের ধর্ম পালন করিত। পরে তাহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। তাহারা 'বসুদেব' ইত্যাদি হিন্দু নামও রাখিতে আরম্ভ করে।

কণিষ্ক নিজে অশোকের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। অশোকের ন্যায় তিনিও রাস্তার পাশে কূপ খনন এবং পান্থশালা স্থাপন করেন। তিনিও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি পুরুষপুরে চারিশত ফুট উচ্চ এক কাষ্ঠনির্মিত বৌদ্ধমন্দির স্থাপন করেন। তিনি একটি বিরাট চৈত্যও স্থাপন করিয়াছিলেন। কুষাণ আমলে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশ, মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি স্থানে প্রচার লাভ করে। অশোকের ন্যায় কণিষ্কও এক বৌদ্ধধর্মসভা আহ্বান করেন। ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। তাহারা হীনযান ও মহাযান—এই দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। হীনযান বৌদ্ধগণ

হইল। এই কারণে এক ব্যক্তির হস্তে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। সুল্লা, পম্পে, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি নেতারা নিজ নিজ ইচ্ছামত সাম্রাজ্যের শাসন চালাইতে লাগিলেন। সীজারের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ব্রুটাস্ নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন অনুচর সহ রোমের গণতন্ত্র রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হত্যা করেন। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষা পাইল না। জুলিয়াস সীজারের কালে গণ-তন্ত্রের যেটুকু চিহ্ন বা ছিল, তাহাও শীঘ্রই বিনষ্ট হইল। জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টাভিয়াস সীজার শীঘ্রই রোমের একমাত্র শাসক নির্বাচিত হইলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে 'মহা-মহিম' বা 'অগাস্টাস্' উপাধিতে ভূষিত করা হইল। ইহার কিছু-দিন বাদে তিনি সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন।



চিত্র ৬৪ : জুলিয়াস সীজার

রোমে যে সকল সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক ছিলেন। মার্কাস্ অরেলিয়াস্ ছিলেন একজন উচ্চ আদর্শবাদী সম্রাট। তিনি নিজেকে জনসাধারণের সেবক বলিয়া মনে করিতেন। ক্যালিগুলা ছিলেন অর্ধ-উন্মাদ। নীরো ছিলেন অত্যাচারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। তিনি তাঁহার মাতা ও স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বৃটেনে এক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং ইতালিতে এক ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড হইয়াছিল। এই সকল নানাকারণে নীরো রোমানগণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

সম্রাটগণের আমলে রোম উন্নতির চরম শিখরে পেঁৗছিয়াছিল। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। রোম নগরী ছিল সৌন্দর্যের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। বড় বড় অট্টালিকা, জনসাধারণের জন্য স্নানাগার, রঙ্গমঞ্চ, সুন্দর সুন্দর তোরণ ও স্তম্ভ ইত্যাদি রোম নগরীর শোভা

বর্ধন করিত। রোমের লোকের মধ্যে রাজকর্মচারী, সৈনিক, ক্রীতদাস এবং স্বাধীন শ্রমিক—এই কয়েকটি শ্রেণীর কথা উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এক শ্রেণীর লোক যথেষ্ট অর্থশালী হইতে লাগিল, অপর শ্রেণী গরিব হইতে লাগিল। সস্তায় ক্রীতদাসগণকে কাজে খাটাইয়া শিল্পের উন্নতি করা সম্ভব হইল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে নানাপ্রকার মূল্যবান সামগ্রী রোমে আসিতে লাগিল। মিশর এবং সিসিলি হইতে আসিল প্রচুর খাদ্যশস্য।



চিত্র ৬৫ : প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ (কলোসিয়াম)

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও তখন ছিল। সার্কাস, মানুষ ও পশুর লড়াই, শিকার, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি ছিল তখনকার প্রধান আমোদ-প্রমোদ। চতুর্দিকে ঘেরাও করা একটি খোলা জায়গায় মল্লযুদ্ধ, পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই ইত্যাদি হইত। চতুর্দিকে লোক বসিবার স্থান ছিল। এইরূপ স্থানকে "এম্ফিথিয়েটার" বলা হইত।

ইওরোপীয় সভ্যতায় রোম সাম্রাজ্যের দান অল্প নহে। দূরবর্তী প্রদেশ-গুলিতে শান্তি বজায় রাখা, প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা ইত্যাদি রোম সাম্রাজ্য হইতে ইওরোপে আসিয়াছে। আইন-কানুন, সাহিত্য, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন, জনসাধারণের সুবিধার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি নানা কিছুর দৃষ্টান্ত রোম হইতে আসিয়াছে। ঐ সময়কার সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভার্জিল, হোরেস, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে লিভি, টেসিটাস্ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

জুলিয়াস সীজার নিজেও বৃটেন সম্পর্কে একখানা ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। ইনিয়াস নামক এক গ্রীক্ বীর ট্রয়ের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর সমুদ্রপথে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি ইতালির লেশিয়াম্ নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেইখানেই তিনি শেষ পর্যন্ত রহিয়া যান। ইনিয়াসের ঘটনা লইয়া ভার্জিল এক মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। লিভি প্রজাতন্ত্রের আমলের রোমের ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং টেসিটাস্ "জার্মানিয়া" নামক গ্রন্থে জার্মানি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছেন।



চিত্র ৬৬ : ভার্জিল

সম্রাট ট্রাজান এবং হাড্রিয়ানের আমলে রোম সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের প্রায় নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে কুষাণ রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সহিত রোম সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিল। কুষাণরাজ দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্ সম্রাট ট্রাজানের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া রোম সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ ছিল আরও বেশি। দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি হইতে ভারতীয় জাহাজ রোম সাম্রাজ্যের নানা অংশে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। ভারতবর্ষ হইতে তখন রেশম, মসলিন, কাপড়, হাতীর দাঁত, মসলা, মণি-মুক্তা, রং ইত্যাদি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে চালান দেওয়া হইত। রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভারতীয় জিনিসের চাহিদা ছিল খুব বেশী। তাহার পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে সোনা, তামা, দস্তা, পাথর-কাচ ও রূপার বাসন ইত্যাদি ভারতবর্ষে আসিত। ঐ সময়ে রোমান বণিকরা দক্ষিণ ভারতে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দুইটি গুদাম তৈয়ার করিয়াছিল। রোমান ঐতিহাসিক স্ট্রাবোর লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একবার এক ভারতীয় রাজা রোম সম্রাটকে একটি হাতহীন মানুষ, বিভিন্ন ধরনের সাপ এবং কচ্ছপ ইত্যাদি কতকগুলি অদ্ভুত জিনিস উপহার পাঠাইয়াছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এত প্রচুর পরিমাণে সোনা ভারতবর্ষে আসিত যে, কুষাণ রাজগণ রোমের অনুকরণে সোনার মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের সোনা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে দেখিয়া ঐতিহাসিক প্লিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আলোচনা

১। রোমের সহিত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। রোম সাম্রাজ্যের উন্নতির পথে রোমানগণের কি দান ছিল?

৩। জুলিয়াস সীজার অগাস্টাসের কথা যাহা জান লিখ। ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1958]

৪। রোমের প্রথম সম্রাট কে? রোমান সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের বিবরণ লিখ। রোমের শ্রেষ্ঠ কবি ও দুইজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের নাম বল। [M.E. 1956]

৫। ঐতিহাসিক টীকা লিখ :
(ক) জুলিয়াস সীজার [M.E. 1964, '67] (খ) সম্রাট নীরো, [M.E. 1968], (গ) ইনিয়াস, (ঘ) স্ট্রাবো, (ঙ) হ্যানিবল [M.E. 1968]

৬। রোমে জনসাধারণের জন্য কি কি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল?

৭। ক্রীতদাসেরা রোমে কি কি কাজ করিত?

৮। এক কথায় উত্তর দাও :
(ক) জুলিয়াস সীজারকে কে হত্যা করেন? (খ) কোন্ সম্রাট মাতা ও পিতাকে হত্যা করেন? (গ) অর্ধ-উন্মাদ সম্রাটের কি নাম ছিল? (ঘ) 'এম্ফিথিয়েটার' কাহাকে বলে? (ঙ) ইনিয়াসের বিষয় লইয়া কোন্ সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করেন? জার্মানির বর্ণনা কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র—রোমের একমাত্র শাসক নির্বাচিত হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে—বা—উপাধিতে ভূষিত করা হইল। (খ) কুষাণরাজ দ্বিতীয়—সম্রাট—নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। (গ) রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র—জিনিসের—ছিল খুব বেশি। কুষাণরাজগণ—অনুকরণে —মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভারতে বিদেশীয় রাজগণের রাজত্বকাল : বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই বিভেদ ও দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বিদেশীয়রা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। একে একে ব্যাক্‌ট্রিয় বা বাহ্লীক গ্রীক্‌গণ, পার্থিয়ান বা পহ্লবগণ এবং শকগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ রাজত্ব স্থাপন করিল।

বুদ্ধের কোন মূর্তি প্রস্তুত করার পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা বুদ্ধের পায়ের ছাপ বা একটি শূন্য আসন সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিত। মহাযানগণ বুদ্ধের মূর্তি পূজা করিত। কণিষ্কের সভায় মহাযান মতই গৃহীত হইয়াছিল। বর্তমান চীন, জাপান, তিব্বত ইত্যাদি দেশে মহাযান বৌদ্ধমত প্রচলিত। ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে হীনযান মত প্রচলিত। কণিষ্কের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে প্রচার লাভ করিয়াছিল।

কণিষ্কের রাজত্বের পর আর কোন কুষাণরাজ এত শক্তিশালী হন নাই। কুষাণ সাম্রাজ্য প্রায় তিনশত বছর স্থায়ী হইয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে কুষাণবংশের রাজত্বকাল একটি স্মরণীয় অধ্যায়। সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদি সকল দিক দিয়া কুষাণ রাজত্বকাল ছিল এক গৌরবময় যুগ। ঐ সময় ভারতীয় প্রভাব ভারতের বাহিরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। রোমান, গ্রীক্ এবং ভারতীয় প্রভাবের যোগাযোগের ফলে ঐ সময়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্প অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারেও কুষাণগণের রাজত্বকাল অত্যন্ত উন্নত ছিল। একমাত্র রোম সাম্রাজ্য হইতে তখন ভারতবর্ষ বছরে দেড় কোটি টাকা লাভ করিত। সুগন্ধ দ্রব্য, মসলিন, মসলা, রেশম, জরির কাজ-করা কাপড়, মণিমুক্তা ইত্যাদি ভারতবর্ষ হইতে রোম সাম্রাজ্যে পাঠান হইত।

আলোচনা

১। বাহ্লিক গ্রীক্ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?
২। পহ্লবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?
৩। 'কণিষ্ক কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন'—কেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।
৪। কুষাণ আমলে বিদেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৫। কুষাণ বলিতে কাহাদের বুঝায়? সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ সম্রাটের রাজত্বকাল বর্ণনা কর। [M.E. 1955, 1959]
৬। ঐতিহাসিক টীকা লিখ :
(ক) কণিষ্ক [M.E. 1954, 1957, 1961], (খ) মিলিন্দপঞ্হ, (গ) মহাযান।
৭। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কণিষ্ক কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?
৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :
(ক) বাহ্লিক গ্রীক্‌গণের পর—ভারতবর্ষে আসে। (খ) প্রথম—ছিলেন কুষাণ—স্থাপয়িতা। (গ) কণিষ্কের রাজধানী ছিল—বর্তমান—।

(ঘ) কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন—। (ঙ) অশোকের ন্যায় কণিষ্কও এক— আহবান করেন।

৯। এক কথায় উত্তর দাও :
(ক) উজ্জয়িনীর সর্বশ্রেষ্ঠ অধিপতির নাম কি? (খ) 'ইউচি' জাতি কাহারা? (গ) চীনদেশের সহিত কে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? (ঘ) বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে কে পারদর্শী ছিলেন? (ঙ) কাহারা বুদ্ধের পায়ের ছাপ সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিত?

১০। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? কি কি কারণে তাঁহার রাজত্বকাল ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছে? [M.E. 1968]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যীশু খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচার

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানে জেরুজালেম নামে একটি দেশ আছে। ইহার একটি প্রদেশের নাম জুডা। জেরুজালেম দেশে ইহুদিদের বাস ছিল। ইহুদিরা তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন। তাহাদের দেশ তখন ইস্রায়েল ও জেরুজালেম—এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ সময়ে অগাস্টাস ছিলেন রোমের সম্রাট এবং হেরড ছিল জুডার গভর্নর বা প্রদেশপাল।

পরাধীন ইহুদিগণ তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ইহুদি পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের উপর ধর্মের নামে অত্যাচার চালাইত। এমন সময়ে এক মহাপুরুষ ইহুদি জাতিকে অধর্ম, অন্ধ-বিশ্বাস এবং পুরোহিত-শ্রেণীর অত্যাচার হইতে বাঁচান। এই মহাপুরুষ যীশু খ্রীষ্ট নামে পরিচিত। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমতকে খ্রীষ্টধর্ম বলা হয়। ইহুদিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর বা ত্রাণকর্তা তাহাদের মধ্যে আসিবেন—এই কথা ইহুদি ঋষিরা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে হইতেই প্রচার করিয়াছিলেন। যীশুই ছিলেন সেই ত্রাণকর্তা।

মেরী ছিলেন যীশুর মাতা। যোজেফ্ নামক এক দরিদ্র ছুতারের সহিত মেরীর বিবাহ হইয়াছিল। যীশুকে অবশ্য ভগবানের সন্তান বলা হয়, যোজেফ্ তাঁহার পিতা এই কথা বলা হয় না। যীশু খ্রীষ্টের জীবন সম্পর্কে নানাপ্রকার কাহিনী-কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল কাহিনী-কিংবদন্তী কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

জুডার বেথেল্‌হেম নামক শহরে এক আস্তাবলে খড়ের গাদায় যীশুর জন্ম হয়। কথিত আছে যে, যীশু জন্মগ্রহণ করিলে পারস্য হইতে তিনজন সাধু যীশুকে দেখিবার এবং তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য বেথেল্‌হেমে আসেন। এক উজ্জ্বল তারা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। এই সাধুদিগকে "ম্যাজি" বলা হয়। তাঁহারা প্রথম হেরডের নিকট যীশুর খোঁজ করেন। হেরড তাঁহাদের নিকট হইতে যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া মনে মনে যীশুকে হত্যা করিবার সংকল্প করিল। কারণ, হেরড ছিল অন্ধ-বিশ্বাসী জুডাধর্মাবলম্বী। হেরড ঐ সাধু ব্যক্তিদিগকে যীশুর খোঁজ করিতে এবং যীশু খ্রীষ্ট কোথায় আছেন তাহা জানাইতে বলিল। সাধুরা আবার সেই তারা দেখিতে পাইলেন। তারাটি তাঁহাদিগকে আবার পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল এবং যে আস্তাবলে যীশুর জন্ম হইয়াছে তাহার উপর আসিয়া থামিল। সাধুরা যীশু খ্রীষ্টের আরাধনা করিলেন এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য এবং সোনা দান করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন যীশু খ্রীষ্ট কোথায় আছেন সেই কথা হেরডকে না বলেন। তাঁহারা চুপি চুপি বেথেল্‌হেম ত্যাগ করিলেন। ঈশ্বর যোজেফ্‌কে আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন যীশুকে লইয়া মিশরে পলায়ন করেন। যোজেফ্‌ তাহাই করিলেন। এইদিকে হেরড যীশুর কোন খোঁজ না পাইয়া বেথেল্‌হেমের দুই বছরের অল্প বয়স্ক সকল পুরুষ শিশুকে হত্যা করিল। হেরডের মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদেশে যোজেফ্‌ যীশুকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই কাহিনীকে সত্য বলা যায় না।

যীশু খ্রীষ্টের প্রথম জীবনের ঘটনা আমরা জানি না। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেইরূপ শিক্ষা যীশু লাভ করেন নাই। তিনি প্রথম জীবন হইতেই ধর্ম ও ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কিভাবে তিনি তাঁহার দেশবাসীর দুঃখ, দুর্দশা, অন্ধ-বিশ্বাস ইত্যাদি দূর করিতে পারেন, তাহার চিন্তা যীশুকে পাইয়া বসিল। ইহুদিদের মধ্যে ঐ সময়ে বহু ধর্মপ্রচারক প্রচারকার্য চালাইতেছিলেন। ইহুদিদের জীবন তখন নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ ছিল।

ঐ সময়ে জন নামে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের কথা জানিতেন। তিনি ইহুদিদিগকে নিজ নিজ পাপকার্যের জন্য অনুতাপ করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। অপরাধীদের নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া ভগবানের রাজ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে তিনি উপদেশ দিতেন।

যীশু খ্রীষ্ট জনের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা

'ব্যাপ্টিজম্' (Baptism) নামে পরিচিত। জর্ডান নদীর পবিত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ধর্মে দীক্ষা দেওয়াকে ব্যাপ্টিজম্ বলা হয়। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণে ব্যাপ্টিজমের প্রয়োজন হয়। জনের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জন ও যীশু উভয়ে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

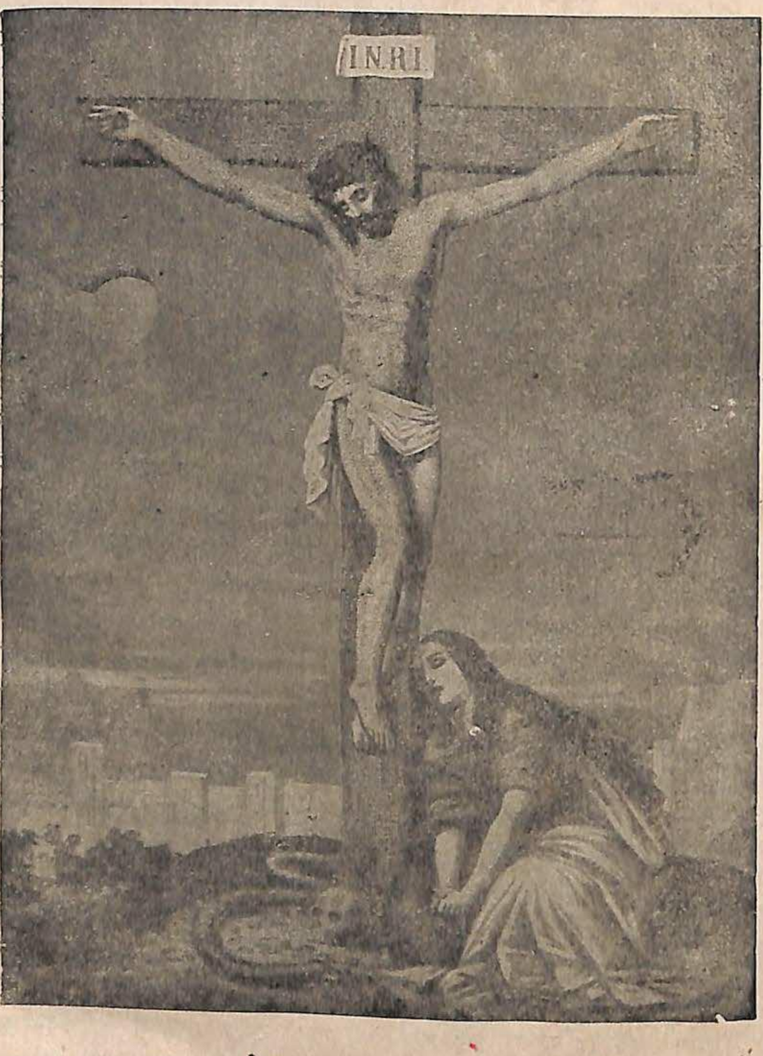
জন ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের অগ্রদূত। তিনি যীশু খ্রীষ্টের বাণী গ্রহণের জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত এবং প্রচারকার্য অন্ধ-বিশ্বাসী শাসকগণকে ভীত করিল। তাঁহার নির্ভীক আচরণ তাহাদিগকে বিচলিত করিল। জনকে এইজন্য প্রাণ হারাইতে হইল।

যীশু খ্রীষ্টের ধর্মমত বুদ্ধের ধর্মমতের ন্যায়ই সহজ এবং সরল। তিনি প্রচার করিলেন যে, সব মানুষই ভগবানের সৃষ্ট। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই। দয়া, অহিংসা এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব—এইগুলিই হইল প্রকৃত ধর্ম। হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া মনকে পবিত্র করিলেই ভগবানের রাজ্যে স্থান পাওয়া যাইবে। সেই কারণে শত্রুকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। ভগবানের রাজ্য সকলের নিকটই উন্মুক্ত। সেখানে ধনী ও দরিদ্রের কোন প্রভেদ নাই।

যীশুর বাণী এক নূতন পথ দেখাইল। বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইল। তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য বহুলোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তিনি নানাভাবে তাহাদিগকে ধর্ম, অধর্ম, পাপ-পুণ্যের ধারণা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন—"যাহারা মনকে পবিত্র রাখে, যাহারা অপরকে দয়া দেখায়, যাহারা ভগবানের জন্য কষ্ট ভোগ করে এবং দারিদ্র্য গ্রহণ করে—তাহারাই ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।"

যাহারা গোঁড়ামি পছন্দ করিত, তাহারা যীশু খ্রীষ্টের ধর্মমত সহ্য করিল না। যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করা হইল যে, তিনি রাজত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যীশুকে গ্রেপ্তার করা হইল। জুডাস নামে যীশুর এক শিষ্য ত্রিশটি রৌপ্য-মুদ্রার লোভে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল। বিচারে যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়া মারিবার হুকুম হইল। তাঁহাকে হাতে পায়ে পেরেক ঠুকিয়া একটি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারা হইল। তাঁহার শিষ্যগণের উপর অত্যাচার চলিল। তাহাদিগকে ধরিয়া আগুনে পুড়ান হইল; বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ারের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। অনেকে আবার ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল। এইভাবে তিনশত বছর ধরিয়া অত্যাচার চলিল, কিন্তু সত্যকে দমন করা সম্ভব হইল না। যীশুর বাণী অমর হইয়া রহিল। তিনশত বছরের অত্যাচারের পর রোম সম্রাট কন্স্টান্টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করিলেন। ইহার পর হইতে

খ্রীষ্টধর্ম ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম একটি।



চিত্র ৬৮ : ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু

আলোচনা

১। যীশু খৃীষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁহার মাতাপিতার নাম কি?
২। সংক্ষেপে যীশু খৃীষ্টের জীবনী বর্ণনা কর। তাঁহার উপদেশ কি?
[M.E. 1967, 1970]
৩। জন কে? তাঁহার ধর্মমত কি ছিল?
৪। কি কারণে যীশুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্য : ভারতের সুবর্ণ যুগ

রোমে যখন সম্রাটগণের রাজত্বকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, তখন ভারতবর্ষে এক অতি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। এই সাম্রাজ্য খৃীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়।

পাটলিপুত্রের রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত একজন সামান্য রাজা ছিলেন। তিনি লিচ্ছবী বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে চন্দ্রগুপ্তের মর্যাদা, ধনদৌলত এবং প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিছুকাল পরে তিনি মগধ এবং ইহার নিকটবর্তী সকল স্থান অধিকার করেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার যোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে তাঁহার সিংহাসনের অধিকার দান করিয়া যান। সমুদ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দান করেন।

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন অসামান্য বীর। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁহার চরিত্র ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস সম্পর্কে সভাকবি হরিষেণ একটি প্রশস্তি লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রশস্তিটি একটি স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা হইয়াছিল। তিনি আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য, দুই-দিকই জয় করেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি মধ্য-ভারতের অরণ্যময় রাজ্যগুলিও জয় করেন। তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া পার্শ্ববর্তী দেশগুলি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে। সুদূর সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার নিকট দূত পাঠান। সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি লইয়া মেঘবর্ণ বোধগয়ায় সিংহলের বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণের জন্য একটি মঠ নির্মাণ করেন। দিগ্বিজয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা এবং সুশাসকই ছিলেন তাহা নহে। তিনি নিজে কবি ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় অংকিত মূর্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি বীণা বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার হাতের লেখাও ছিল অতীব সুন্দর।



চিত্র ৬৯ : সমুদ্রগুপ্ত



চিত্র ৭০ : সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেছেন (প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা)

তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইলেন। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত। তাঁহার একটি রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার রাজসভায় কালিদাস ইত্যাদি নবরত্ন উপস্থিত ছিলেন। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন। গুজরাট, কাথিয়াবাড়, মালবদেশ তিনি জয় করেন। তাঁহার সময় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ এদেশে আসেন। ফা-হিয়েন্ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। লোকজন অত্যন্ত আনন্দে দিন কাটাইত। কাহারও কোনরূপ অভাব ছিল না। চুরি-ডাকাতি হইত না। মদ, পেঁয়াজ, রসুন খাওয়া তখন নিষিদ্ধ ছিল। রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা লইত না, অনেক দিন পরেও সেইস্থানে সোনা পড়িয়া আছে দেখা যাইত। লোকজন দরজা খুলিয়া ঘুমাইলেও কেহ তাহাদের জিনিসপত্র চুরি করিত না। পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে সরাইখানা ইত্যাদি থাকিত। রাজধানীতে একটি বড় হাসপাতাল ছিল। সেখানে চিকিৎসার কোন খরচ লাগিত না। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে সরকার কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজস্বের পরিমাণ খুব সামান্য ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। অপরাধীকে কোনপ্রকারের নির্মম শাস্তি

দেওয়া হইত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ব্যবসা-বাণিজ্য তখন খুব বাড়িয়াছিল। দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ছিল বলিয়া বণিকগণ সহজেই দেশের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিত। তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রপথেও তখন বাণিজ্য চলিত। চীন, রোম, সিংহল ইত্যাদি দেশের সহিত তখন ভারতের যোগাযোগ ছিল।

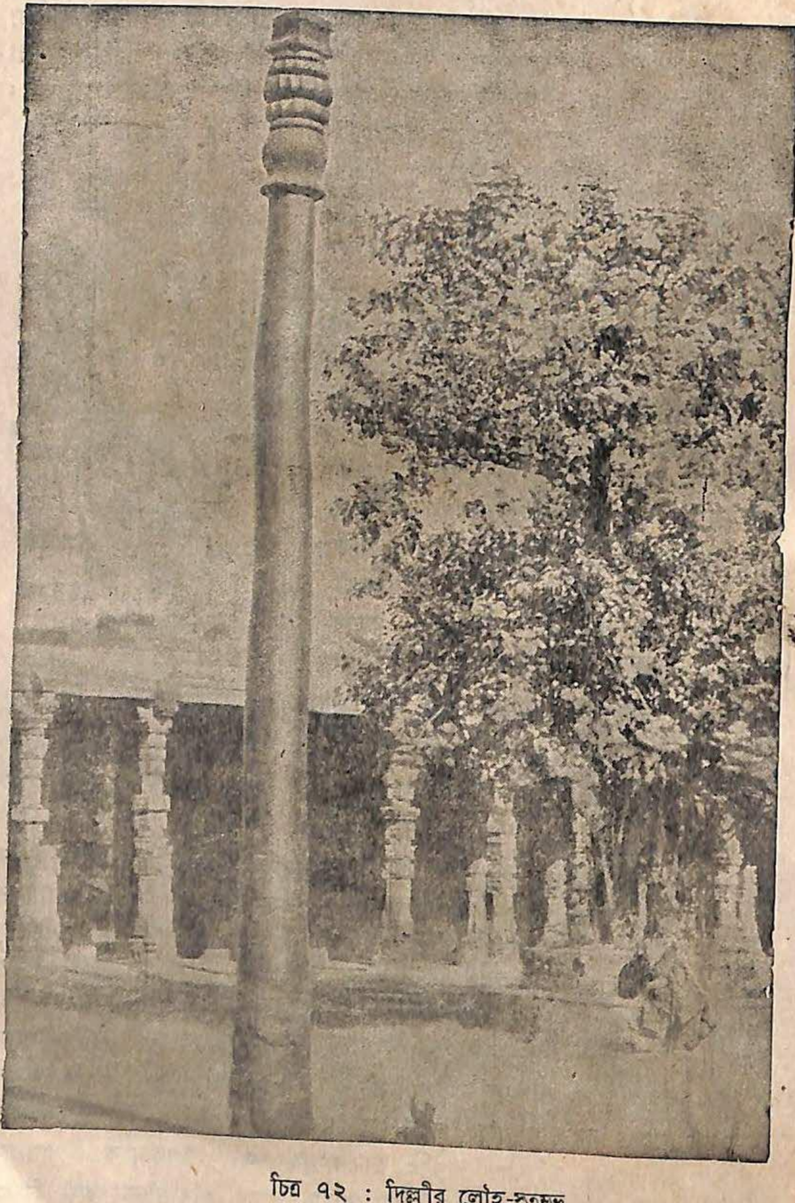

চিত্র ৭১ : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা হইতে)

বিক্রমাদিত্যের পর প্রথম কুমারগুপ্ত রাজা হন। তিনি তাঁহার পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার সময়ই হূণরা ভারত আক্রমণ করে। ইহার পর হইতেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব কমিতে থাকে। দেশের মধ্যে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয়। পরবর্তী রাজগণ দুর্বল ছিলেন। তাঁহারা এই সকল অরাজকতা দমন করিতে বা বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্তী রাজগণ—স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত, বুধগুপ্ত ইত্যাদির আমলে গুপ্ত বংশের গৌরব ক্রমে লুপ্ত হয়, গুপ্ত সাম্রাজ্যও ভাঙিয়া পড়ে।

ভারতের সুবর্ণ যুগ :

ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হইয়া থাকে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। গুপ্ত আমলে ভারতের দ্বিতীয় বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। শাসনের দিক দিয়াও গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। ফা-হিয়েন তাঁহাদের শাসনের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল ছিল। অসন্তোষ বলিয়া কোন কিছু তাহাদের ছিল না।

গুপ্তগণ ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। গুপ্ত রাজগণ হিন্দু হইয়াও অন্য ধর্মের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। হিন্দুগণ নানা দেব-দেবীর পূজা করিত। প্রকৃত ধর্মভাব এবং শ্রদ্ধা সহকারে তখন দেব-দেবীর পূজা করা হইত। ঐ সময়ে ভক্তিবাদ অর্থাৎ ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। হিন্দুধর্ম তখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু



চিত্র ৭২ : দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ

বৌদ্ধধর্মও তখন এক শক্তিশালী ধর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল। ফা-হিয়েন্ বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন মঠে হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। পাটলিপুত্রে তিনি সম্রাট অশোকের প্রাসাদ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্রে তিনি দুইটি বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। ইহার একটি ছিল হীনযান, অপরটি মহাযান বৌদ্ধদের। এই দুই



চিত্র ৭৩ : অজন্তা প্রাচীর চিত্র : খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী



চিত্র ৭৪ : অজন্তা গুহার আর একটি ছবি

মঠের মোট ভিক্ষু সংখ্যা প্রায় ছয় সাত শত ছিল। ফা-হিয়েন্ তিন বৎসর পাটলিপুত্রে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ শোভাযাত্রারও খুব প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সিন্ধু হইতে মথুরা পর্যন্ত অঞ্চলে ফা-হিয়েন্ বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। এই সকল মঠে তখন হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। একমাত্র মথুরায় তিনি কুড়িটি বড় বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। এই সকল মঠের ভিক্ষু সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। ফা-হিয়েন্ ভারতবাসিগণের পরস্পর ধর্মসহিষ্ণুতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত ছিল তখন রাজভাষা। ঐ সময়ে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে। মহাকবি কালিদাস ঐ সময়ে শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি অমর গ্রন্থ রচনা করেন। কালিদাস ভিন্ন শূদ্রক, বিশাখ দত্ত ইত্যাদি সাহিত্যিকগণও ঐ সময়ে জন্মিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলা, রাজা দুষ্মন্তের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে নন্দরাজকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। বেদ, রামায়ণ,



চিত্র ৭৫ : অমরাবতী স্তূপে পুষ্পাঙ্ক : খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক

মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গুপ্তযুগেই পুস্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঐ সময় ঘটিয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজে বীণা বাজাইতেছেন, এইরূপ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাতুনির্মাণ-শিল্পও খুব উন্নত হয়। দিল্লীর নিকট চন্দ্ররাজের লৌহ-স্তম্ভ ধাতুনির্মাণ-শিল্পের পরিচয় দিতেছে। অজন্তা পাহাড়ের গায়ে উনত্রিশটি গুহা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই গুপ্তযুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। ঐ সকল গুহার ষোলটি প্রাচীরচিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুদ্ধের মূর্তি,

বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনার ছবি আঁকা হইয়াছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে 'মা ও সন্তান' এবং 'রাজকুমারীর মৃত্যু' ইত্যাদি চিত্রগুলি খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

বিজ্ঞানের দিক দিয়াও গুপ্তযুগ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট ও বরাহ-মিহির গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানও ঐ সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। জন্তু-জানোয়ারের শরীরের বিভিন্ন অংশ কাটিয়া শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা ঐ সময়ে করা হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসাও ঐ সময়ে করা হইত বলিয়া মনে করা হয়। আরব এবং গ্রীসদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি গুপ্তযুগের ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যার উপর বহু পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল।

গুপ্তযুগে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। শাসন-ব্যবস্থা, জনসাধারণের অবস্থা, বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সবদিক দিয়াই এই যুগে খুব উন্নতি ঘটিয়াছিল। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগও এই সময়ে যথেষ্ট ছিল। গুপ্তযুগকে গ্রীক্-ইতিহাসের পেরিক্লিসের যুগ এবং ইংরেজ ইতিহাসের এলিজাবেথের যুগের সহিত তুলনা করা হয়। সত্যই ইহা প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগ।

আলোচনা

১। সংক্ষেপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল বর্ণনা কর। ফা-হিয়েন্ কে? তাঁহার বিবরণ হইতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায়? [M.E. 1956, 1960]

২। গুপ্তযুগকে 'ভারতের ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ' বলা হয় কেন? এই প্রসঙ্গে গুপ্তযুগের সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [M.E. 1955, '61, '68]

৩। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় ও চরিত্র বর্ণনা কর। [M.E. 1954]

৪। গুপ্তযুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল? [M.E. 1959]

৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীরাজ 'শকারি বিক্রমাদিত্য' কেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। সে যুগে যে যে বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [M.E. 1967]

৭। টীকা লিখ :
ফা-হিয়েন্ [M.E. 1967]

৮। গুপ্তযুগে বিজ্ঞান চর্চায় ও চিকিৎসা শাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, আলোচনা কর। [M.E. 1970]

সময় নির্দেশ

রোম নগরীর স্থাপন	...	খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩
রোম সাম্রাজ্যের কাল		**খ্রীঃ পূঃ ২৭—৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ**
পিউনিক যুদ্ধ : প্রথম	...	খ্রীঃ পূঃ ২৬৭—২৪০ খ্রীঃ পূঃ
দ্বিতীয়	...	" " ২১৭—২০২ " "
তৃতীয়	...	" " ১৪৭—১৪৬ " "
জুলিয়াস সীজার		" ১০৩ (জন্ম)—৪৪ খ্রীঃ পূঃ (মৃত্যু)
(কয়েকজন প্রধান রোমান সম্রাট)		
অক্টাভিয়াস (অগাস্টাস)	...	খ্রীঃ পূঃ ২৭—১৪ খ্রীষ্টাব্দ
ক্যালিগুলা	...	৩৭ খ্রীষ্টাব্দ— ৪১ "
নীরো	...	৫৪ " — ৬৮ "
ট্রাজান	...	৯৮ " —১১৭ "
মার্কাস অরেলিয়াস	...	১৬১ " —১৮০ "
কন্‌স্টান্‌টাইন	...	৩০৬ " —৩২৩ "
কুষাণ বংশ :		**৪০ খ্রীষ্টাব্দ—২২০ খ্রীষ্টাব্দ**
প্রথম কদ্‌ফিসিস্‌	...	৪০ " — ৭৮ "
দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌	...	৭৮ " —১১০ "
কণিষ্ক	...	১২০ " —১৬০ "
গুপ্ত বংশ :		**৩২০ খ্রীষ্টাব্দ—৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দ**
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	...	৩২০ " —৩২৫ "
সমুদ্রগুপ্ত	...	৩২৫ " —৩৭৫ "
চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য	...	৩৮০-১ " —৪১৫ "
কুমারগুপ্ত	...	৪১৫ " —৪৪৫ "
